চারদিক যখন অন্ধকার

অনীশ দেব

ফোনে কথা বলতে-বলতেই মায়ের মুখটা সাদাটে হয়ে গেল। চোখে একইসঙ্গে বিরক্তি আর ভয় ফুটে উঠল। মা কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে স্পষ্ট কোনও কথা বেরোচ্ছিল না। শুধু এলোমেলো শব্দের টুকরো ছিটকে বেরোচ্ছিল।

আমি পড়ার টেবিলে বসেছিলাম। খোলা বইয়ের পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু পড়ায় মন বসছিল না। শুধু বাবার কথা মনে পড়ছিল। সামনের জানলা দিয়ে ঘোলাটে আকাশ দেখছিলাম। সেখানে দুটো চিল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

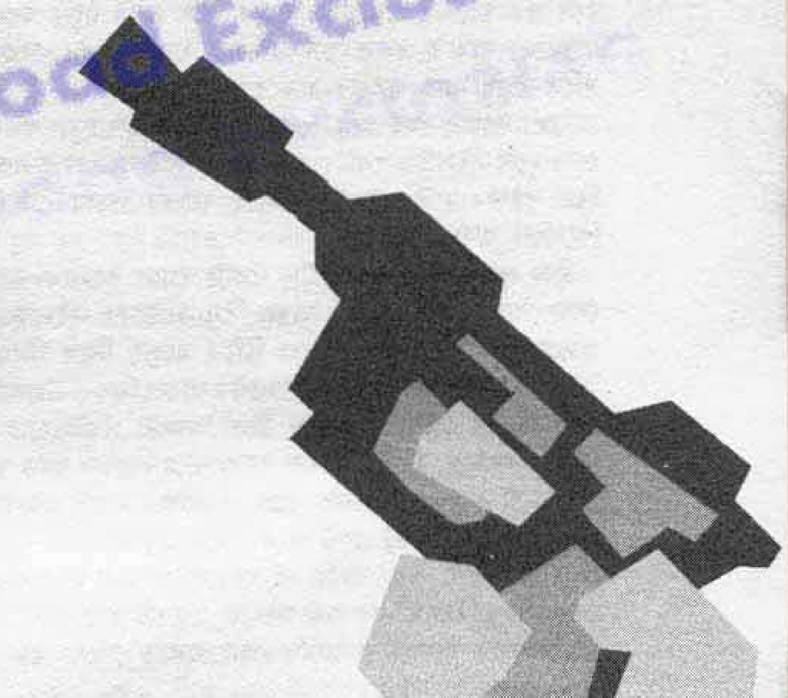
স্যাটেলাইট মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি সেদিকে ফিরে তাকিয়েছিলাম। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা আর ভয় চলকে উঠেছিল। কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম, কে ফোন করতে পারে, কারা ফোন করতে পারে।

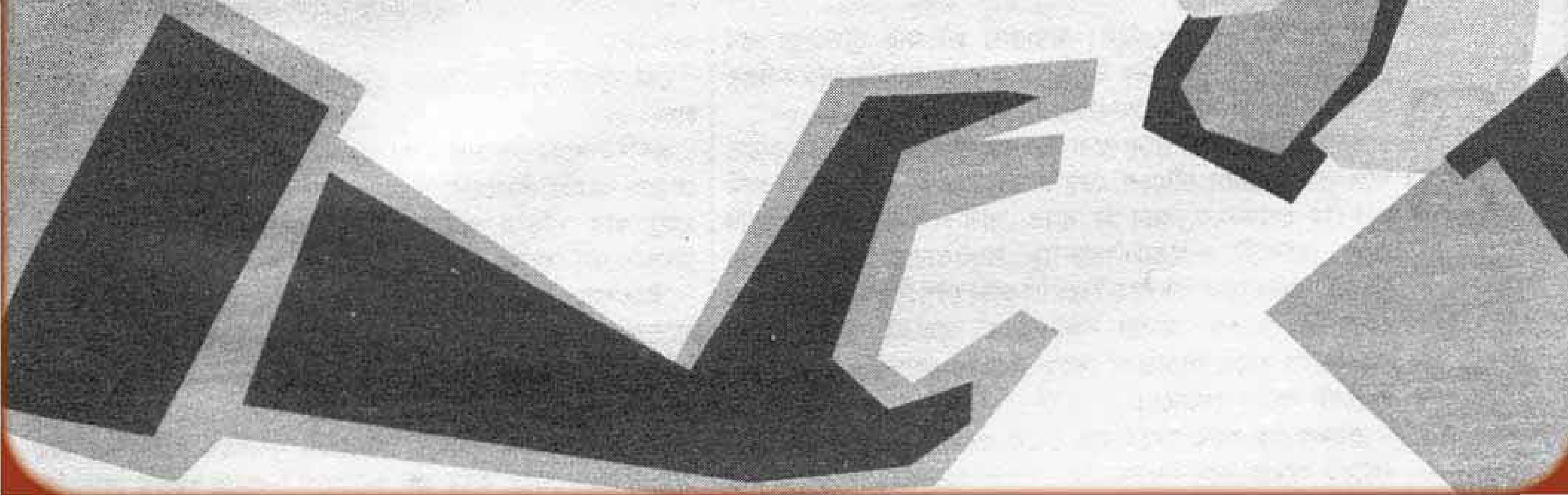
মোবাইল ফোনটা বাবার। বাবা এখন আর ফোনটা ব্যবহার করে না। কারণ, বাবা দেড়মাস আগে মারা গেছে।

যে-লোকটা ফোন করেছিল সে বোধহয় ফোন রেখে দিল। কারণ, দেখলাম, মা ফোনটা কান থেকে নামিয়ে বোকার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মায়ের কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম।

মা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আর মায়ের মুখের অসহায় ভাবটা আরও অসহায় হয়ে উঠছিল।

শেষ পর্যন্ত মা কেঁদে ফেলল। আমার কাছে এসে আমাকে জাপটে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। আর বারবার বলতে লাগল, 'আমাদের এখন কী হবে রে, সুকি? ওরা আজ রাতে আবার আসবে বলেছে—।'





আমিও ভয়ে কেঁপে উঠলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়ের হাতের ওপরে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, 'কোনও ভয় নেই, মা। ভয় পেয়ো না, আমি তো আছি!' টের পেলাম, মা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

জুপিটার একটু দূরে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে আমাদের দেখছিল। ও ভয় পায়নি—কারণ, ও রোবট। আমাদের বাড়িতে ডোমেস্টিক সারভিস আর সিকিওরিটির কাজ করে।

সতেরো-আঠেরো বছরের একটা ছেলের যেভাবে মা-কে আশ্বাস দেওয়া উচিত আমি তাই দিলাম বটে, কিন্তু খবরটা শোনার পর আমারও ভয় পাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বাবা বেঁচে থাকলে আমাকে ভরসা দিত, কিন্তু এখন তো সে উপায় নেই!

অবশ্য বাবা থাকলে ফোনটা বাবা-ই ধরত, মা-কে আর ধরতে হত না।

বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার আর মায়ের প্রতিটা দিন-রাত আতঙ্কে-আতঙ্কে কাটে। কারণ, ওই লোকগুলো সবসময় ফোন করে, ভয় দেখায়। ওরা বলে, ওরা নাকি বাবার কাছ থেকে সাড়ে তেইশ লাখ টাকা পায়। ওদের কাছ থেকে বারবার টাকা ধার নিয়ে বাবা নাকি ব্যবসায় ঢেলেছে। সেই ব্যবসা ফেল পড়ায় বাবা আর সেই টাকা শোধ দিতে পারছিল না। তারপর....।

তারপর আমার বাবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

অথচ ছ'মাস আগেও আমাদের জীবনটা কী সুন্দর ছিল! আমরা তিনজনে কত হাসিখুশি থাকতাম। বাবা-মায়ের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসে কত রাজ্যের গল্প হত। ওদের সঙ্গে আমি বন্ধুর মতো আড্ডা মারতাম। বাবা-ই বলত, চাণক্য নাকি বলে গেছেন, 'বয়স্ক পুত্রের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে।'

তো আমার সেই 'বন্ধু' দেড়মাস আগে আত্মহত্যা করল। রেখে গেল দুটো সুইসাইড নোট। একটা তিন লাইনের, আর-একটা সুদীর্ঘ তিন পৃষ্ঠার। দুটো সুইসাইড নোটই আমার পড়ার টেবিলে রেখে গিয়েছিল বাবা।

তিন পৃষ্ঠার সুইসাইড নোটটা বলতে গেলে আমাকে আর মা-কে লেখা বাবার শেষ চিঠি। আর তিন লাইনের সুইসাইড নোটটা পুলিশের জন্যে। সে-কথা বাবা চিঠির মধ্যেই লিখে গিয়েছিল।

বাবার সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপমেন্টের ব্যবসা ছিল—এক্সপার্ট সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার। কোম্পানির নাম ছিল 'আলট্রা সফ্‌টওয়্যার।' বাবার ব্যবসার পার্টনার ছিলেন রীতেশ বসাক নামে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। শুরুতে অবশ্য আমরা সবাই ওঁকে ভদ্রলোক বলেই জানতাম। কিন্তু পরে সে-ধারণা একটু-একটু করে বদলে গেছে।

বাবার ব্যবসা 'ছিল' বলছি এই কারণে যে, বাবা মারা যাওয়ার পর যেসব সাংঘাতিক ঘটনার কথা জানতে পেরেছি আর যেসব কাণ্ড শুরু হয়েছে তাতে ব্যবসাটার অর্ধেক কেন, বলতে গেলে কোনও অংশই আমাদের আর নেই।

আমার বাবা খুব সৎ ছিল। আজকের হাই-ফাই যুগে যার অর্থ বোকা। তো সেই বোকামির দাম বাবাকে এত সাংঘাতিকভাবে দিতে হল। বাবার পর হয়তো আমাদেরও দিতে হবে।

ব্যবসাটা বড় করার জন্যে বাবা দিন-রাত পরিশ্রম করত। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'রীতেশ জেঠু'ও—হ্যাঁ, তখন ওই নামেই আমি ডাকতাম লোকটাকে, আর মা বলত 'দাদা'—নানান অর্ডার ধরার জন্যে ছোটাছুটি করতেন। বড়-বড় সফ্‌টওয়্যার কোম্পানিগুলো 'আলট্রা সফ্‌টওয়্যার'-কে কাজ দিত। তা ছাড়া বেশ কিছু মালটিন্যাশনাল কোম্পানি থেকেও 'আলট্রা সফ্‌টওয়্যার' ডায়রেক্ট অর্ডার পেত। বছরখানেক আগে আমেরিকা থেকে বাবাদের কোম্পানি তিন-তিনটে ডায়রেক্ট অর্ডার পেয়েছে।

এতসব গল্প আমি বাবার কাছ থেকে শুনতাম। বাবা সময়-সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপমেন্টের গল্প করত আর বলত, 'সুকি, তুই কিন্তু বড় হয়ে রোবোটিক্স আর কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার নিয়ে পড়াশোনা করবি। তারপর আমার কোম্পানির হাল ধরবি। ভালো করে পড়। তোর ওপরে আমার অনেক আশা....।'

সেটা আমি বেশ বুঝতাম। কারণ, বাবার নাম কিরণ। আর বাবা আমার নাম রেখেছে সুকিরণ। আমার আর কোনও ভাই-বোন নেই। তাই আমিই ছিলাম বাবার কাছে সব।

ব্যবসা বড় করতে গিয়ে টাকার টান পড়ছিল। তাই কোম্পানিকে ব্যাঙ্ক লোন ছাড়াও লাগামছাড়া সুদে প্রাইভেট লোন করতে হচ্ছিল। ফলে লোনের চাপ বাড়ছিল, বাড়ছিল সুদের চাপও।

রীতেশ জেঠু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। চা খেতেন, হাসি-ঠাট্টা করতেন, আবার বাবার সঙ্গে কোম্পানির সংকট নিয়েও আলোচনা করতেন। ওঁকে আমরা কাছের মানুষ বলে মনে করতাম। তাই অনেক সময় সান্ধ্য চায়ের আসরে আমরা চারজনেই জড়ো হয়ে বসতাম।

আমরা চারজন ছাড়া পাঁচনম্বর একজনও থাকত। সে হল জুপিটার—জুপিটার জি-টুয়েন্টি। গ্লোবাল টেকনোলজির টুয়েন্টিয়েথ এডিশানের ডোমেস্টিক সারভিস অ্যান্ড সিকিওরিটি রোবট।

জুপিটার আমাদের বাড়ির ফাইফরমাশের কাজকর্ম করে। ও চা তৈরি করতে পারে না, তবে চা তৈরি করে ওকে দিলে ও কাপে ঢেলে গেস্টদের সার্ভ করতে পারে। বিস্কুট প্লেটে সাজিয়ে অতিথিদের সামনে টেবিলে দিয়ে আসতে পারে। খাওয়াদাওয়ার পর প্লেট-গ্লাস-বাটি সব টেবিল থেকে তুলে স্মার্ট সিংক-এ নিয়ে গিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারে। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করে মুছে র‍্যাকে গুছিয়ে রাখতেও পারে।

এ তো শুধু একটা কাজের কথা বললাম। এ ছাড়া জুপিটার আরও অনেক কিছু করতে পারে। যেমন, বাড়ির কোনও দরজা খোলা থাকলে ও সেটা ডিটেক্ট করতে পারে এবং চটপট রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপে সেটা লক করে দিতে পারে।

সোজা কথায় সারভিস অ্যান্ড সিকিওরিটি রোবট বলতে আক্ষরিক অর্থে যা বোঝায় জুপিটার তাই।

সুতরাং আমাদের গল্পগুজবের সময় জুপিটার আমাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকত, আমাদের দেখত, আমাদের কথা শুনত। আর দরকার পড়লে ফাইফরমাশ খাটত।

বাড়িতে ডোমেস্টিক রোবট ব্যবহার করলে গভর্নমেন্টের লাইসেন্স লাগে, আর কলকাতা পুলিশের দপ্তর থেকে স্পেশাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হয়। জুপিটারের জন্যে সেসব নেওয়া আছে। বাবা-ই দৌড়ঝাঁপ করে সেসবের ব্যবস্থা করেছে।

বাড়িতে বোকা ভূতের মতো একটা রোবট ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ব্যাপারটা মায়ের বরাবরের অপছন্দ। কিন্তু বাবা আবার ছোটবেলা থেকেই রোবট-পাগল। শুধু যে ডোমেস্টিক রোবট রাখাটা বাবার একমাত্র নেশা তা নয়। বাবার আসল নেশা হল, রোবট তৈরি করা, রোবটের জন্যে সফ্‌টওয়্যার তৈরি করা, ডোমেস্টিক রোবটের মধ্যে নানানরকম সফ্‌টওয়্যার গুঁজে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো—আরও কত কিছু!

তো জুপিটারকেও সেইসব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়মিত যেতে হচ্ছে।

একদিন সন্ধেবেলা চায়ের আসরে বসে কথা হচ্ছিল। বাবা রীতেশ জেঠুকে আমার পড়াশোনা নিয়ে এ-কথা সে-কথা বলছিল। জুপিটার একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল আর বোকা-বোকা চোখে—এটা মায়ের ধারণা—আমাদের দেখছিল।

'রীতেশদা, আমি তো কোনওরকমে গড়িয়ে-গড়িয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে এম.এসসি. পাশ করেছি। আমার সুকি কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ ব্রিলিয়ান্ট। ওর স্কুলের স্কোর বরাবর হাই স্ট্যান্ডার্ডের...।'

আমি অস্বস্তি পাচ্ছিলাম। বাবার এই একটা প্রবলেম। লোকজন কাউকে কাছে পেলেই আমার রেজাল্টের সুখ্যাতির কীর্তন শুরু করে দেয়। রীতেশ জেঠুর কাছে এই কথাগুলো নিশ্চয়ই বহুবার শোনা হিট

গানের মতো।

আমাকে বাঁচাল মা।

'না, না, সুকি পড়ে কোথায়!' কপালে ভাঁজ ফেলে মা বলল, 'আপনার ভাই যেরকম চায় সুকিকে সফ্‌টওয়্যারে সেই লেভেলে পৌঁছতে গেলে ওকে আরও অনেক খাটতে হবে। সুকি তো সবসময় ই-বুক রিডারে গল্পের বই পড়ে, নয়তো হলোগ্রাম টিভির সামনে বসে সারা দুনিয়ার ফুটবল নয় ক্রিকেট খেলা দেখে বেড়াচ্ছে...।'

রীতেশ জেঠু গলা খুলে হাসলেন। ওঁর মাথায় ধবধবে সাদা চুল, তার সঙ্গে সাদা গোঁফ আর সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। হঠাৎ দেখলে নাটকের ছদ্মবেশ বলে মনে হয়।

চোখের সরু ফ্রেমের চশমাটা খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন রীতেশ জেঠু। নাকের গোড়াটা দু-আঙুলে টিপে বারকয়েক রগড়ালেন। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'সুকিরণ, তুমি লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট জানি। কিন্তু তোমাকে নতুন-নতুন সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপমেন্টের বুদ্ধিতে আমেরিকাকে হারাতে হবে। কিরণের ইনটেলিজেন্সও কম নয়। ও প্রচুর এক্সাইটিং ইনোভেটিভ সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপ করেছে—পেটেন্ট নিয়েছে। কিন্তু আমাদের গ্লোবাল মার্কেটে আজকাল ভীষণ লড়তে হচ্ছে—ভীষণ স্টিফ কম্‌পিটিশান, বুঝলে...।'

কথা বলতে-বলতে রীতেশ জেঠু কাশতে শুরু করলেন। তবে দু-চারবার কেশেই সামলে নিলেন। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জুপিটার, এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দেখি!'

জুপিটার একচুলও নড়ল না। যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সেরকমই দাঁড়িয়ে রইল।

রীতেশ জেঠু আর-একবার ওকে হুকুম করলেন। এবারে ওঁর গলার স্বর আরও উঁচু গ্রামে এবং বিরক্ত।

'কী হল, বললাম যে শুনলে না! এক গ্লাস জল নিয়ে এসো—।'

জুপিটার নির্বিকার।

মা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎই খেয়াল করল বাবা হাসছে।

আমিও ব্যাপারটা খেয়াল করেছি।

আমরা দুজনে বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম।

রীতেশ কথার মাঝেই এবার বাবার দিকে ফিরে বলতে শুরু করলেন, 'এ তোমার কীরকম সারভিস রোবট, কিরণ? এ তো সিম্প্‌ল কমান্ডই ক্যারি আউট করতে পারছে না। তুমি...।' বাবাকে হাসতে দেখে রীতেশ কথার মাঝেই থমকে গেলেন, ওঁর মুখে বিভ্রান্ত ভাব ফুটে উঠল।

মা ইতস্তত করে বলল, 'আজ সকালেই তো সুকির এক ক্লাসমেট এসেছিল। তখন তো জুপিটার তার কমান্ড দিব্যি শুনল...।'

বাবা তখনও হাসছে দেখে মা সন্দেহের চোখে বাবার দিকে তাকাল।

'তুমি আবার কিছু কারিকুরি করোনি তো?'

'হ্যাঁ, করেছি, তাই তো তখন থেকে হাসছি।' বাবা এবার বেশ জোরে হেসে উঠল। বাবা একটু মোটা বলে হাসির দমকে বাবার ভুঁড়ি কাঁপতে লাগল।

অবশেষে হাসি থামিয়ে বাবা জুপিটারকে বলল, 'যাও, এক গ্লাস জল নিয়ে এসো—।'

সঙ্গে-সঙ্গে জুপিটার জল আনতে হাঁটা দিল।

মা ভুরু কুঁচকে বাবাকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার বলো তো!'

বাবা দু-হাত নেড়ে বলতে শুরু করল, 'শুনুন, রীতেশদা। আমি জুপিটারের সফ্‌টওয়্যারে নতুন একটা আপগ্রেডেশান প্যাকেজ জুড়ে দিয়েছি ঃ ভয়েস রিকগনিশান সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার। ও যেসব ভয়েস শুনবে তার ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস করে স্পেক্ট্রাল কোইফিশিয়েন্টগুলো বেছে নেবে। তারপর ওর মেমোরিতে যে-ক'টা ভয়েসের কোইফিশিয়েন্ট স্ট্রিং রাখা আছে তার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে। যদি মিলে যায় তবেই ও কথা শুনবে—নয়তো নয়।

'রীতেশদা, আপনার ভয়েসটা ওর মেমোরিতে স্টোর করা ভয়েসগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করেনি। তাই ও আপনার কমান্ড নিতে পারেনি। আসলে জুপিটারের মেমোরিতে রেফারেন্স ভয়েস হিসেবে শুধু আমাদের তিনজনের ভয়েস রাখা আছে—আমার, সুকির, আর ওর—' মায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বাবা বলল, 'এটা করেছি আমাদের ডোমেস্টিক সিকিওরিটির জন্যে। যাতে আমাদের কথা ছাড়া অন্য কারও কথায় জুপিটার হুটহাট করে কিছু করে না বসে।' বাবা আবার হাসল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সফ্‌টওয়্যারটা কাল রাতে আমি ইনস্টল করেছি। আর রীতেশদাকে চমকে দেব বলে টাইমার দিয়ে আজ সন্ধেবেলা অ্যাক্টিভেট করেছি...।'

'রীতেশদা'-কে সেদিন বাবা চমকে দিয়েছিল, আর তার কয়েকমাস পরেই 'রীতেশদা' বাবাকে চমকে দিয়েছেন। এমন চমকে দিয়েছেন যে, সে-চমক বাবা আর সামলাতে পারেনি।

জুপিটার জল নিয়ে ফিরে এসেছিল একটু পরেই। এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবা ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে রীতেশ জেঠুকে দিল।

ঢকঢক করে জলটা খাওয়ার পর রীতেশ জেঠু খালি গ্লাসটা জুপিটারকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর একটু কৌতূহলের চোখে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

জুপিটার গ্লাসটা ধুয়ে তুলে রাখবে বলে চলে যাচ্ছিল, বাবা ওকে অপেক্ষা করতে বলল, যাতে রীতেশ জেঠু জুপিটারকে খুঁটিয়ে দেখার কাজটা শেষ করতে পারেন।

ডোমেস্টিক সারভিস অ্যান্ড সিকিওরিটি রোবট এখন বহু ফ্যামিলি ব্যবহার করে। মডেল অনুযায়ী তাদের দাম। যেমন, জুপিটার জি-টুয়েন্টি একটা সফ্‌টওয়্যার আপগ্রেডেব্‌ল হাই-টেক মডেল।

টেকনিক্যাল কোয়ালিটির দিক ছাড়া আর যেটা বাকি রইল সেটা বাইরের চেহারা। এই চেহারা ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী কাস্টম-বিল্ট হতে পারে, অথবা রোবট কোম্পানির ক্যাটালগের নানানরকম চেহারা দেখে ক্রেতা তার পছন্দের চেহারা বেছে নিতে পারে। সেইজন্যেই এখনকার মডার্ন রোবটগুলোর চেহারা মহিলা কিংবা পুরুষের মতো হতে পারে। হতে পারে দশ-বারো বছর থেকে শুরু করে সত্তর কিংবা আশি বছর বয়েস পর্যন্ত কোনও মানুষের। এই চেহারার জন্যে রোবটের দাম কম-বেশি হলেও তার সার্ভিস এফিশিয়েন্সি একই থাকে।

জুপিটারকে দেখে আঠেরো কি কুড়ি বছরের একজন টাটকা ইয়াংম্যান বলে মনে হয়। আমার কথা ভেবেই মা আর বাবা রোবটের এই চেহারাটা পছন্দ করেছে। ঠিক যেন আমার ভাই বা দাদা। এর আগে যে-মডেলটা আমরা ব্যবহার করতাম সেটার চেহারা ছিল চোদ্দো বছর বয়েসি একটা মেয়ের মতো।

রীতেশ জেঠু জুপিটারকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন বলে আমার বেশ অবাক লাগছিল। কারণ, রীতেশ জেঠুর বাড়িতেও ডোমেস্টিক রোবট আছে। আর সেটাও কম আধুনিক নয়।

বাবা একটু অবাক হয়েছিল। তাই হেসে জিগ্যেস করল, 'অত করে কী দেখছেন, রীতেশদা?'

আপনমনে বারদুয়েক মাথা নেড়ে রীতেশ জেঠু বললেন, 'ওর চেহারাটা আমার পছন্দ। ঠিক যেন সুকিরণের দাদার মতো। কিন্তু, কিরণ, তুমি এটা বলো তো, ওর সফ্‌টওয়্যারে তুমি ভয়েস রিকগনিশান বেস্‌ড অ্যাক্টিভেশান ছাড়া আর কী-কী ব্যাপার অ্যাড করেছ?'

'কয়েকটা জিনিস করেছি, তবে সেগুলোর এখনও ডেভেলাপমেন্ট চলছে। পুরোপুরি স্টেব্‌ল হয়ে গেলে পেটেন্ট নেব। তখন সবাইকে জানাব। আমাদের কোম্পানি সেইসব পেটেন্টের রাইট নিলে আমাদের বিজনেস সিম্প্‌লি ডাব্‌ল হয়ে যাবে, রীতেশদা...।'

আমি জানি, বাবার দশ-বারোটা লম্বা বাঁধানো খাতা আছে। নতুন কোনও সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপ করলেই বাবা তার টাইটেল আর অ্যালগরিদ্‌মগুলো ওই খাতায় লিখে রাখে। আর প্রোগ্রামগুলো কতকগুলো মাইক্রোসিডিতে সেভ করে রাখে।

ছুটির দিনে বাবা কম্পিউটার নিয়ে মেঝেতে বসে। দুপাশে ছড়ানো থাকে ওই খাতাগুলো আর গুচ্ছের মাইক্রোসিডি। তারই মাঝে নাকে চশমা এঁটে কম্পিউটারের ওপরে হুমড়ি খেয়ে থাকে বাবা। আপনমনে

বিড়বিড় করে, খাতায় কীসব নোট নেয় আর কম্পিউটারের বোতাম টেপে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কোনও-কোনও সময় 'ইউরেকা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে বাবা। তারপর : 'সুকি, সুকি! ফাইনালি আই গট ইট। এদিকে আয়। দেখে যা—।'

আমি পড়ার টেবিল ছেড়ে বাবার কাছে ছুটে যেতাম। খাতা আর সিডির জঙ্গল ঠেলে সরিয়ে মেঝেতে বসে পড়তাম বাবার ঠিক পাশটিতে।

তখন বাবা আমাকে নতুন আবিষ্কার করা সফ্‌টওয়্যার প্যাকেজটা বোঝাত। আমি ছাই বুঝলেও বাবার উৎসাহী কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যেতাম।

সমস্ত কিছু বোঝানোর শেষে বাবা বলত, 'সুকি, এসব তোর। তোর জন্যে আমি রেখে যাচ্ছি...।' এ-কথা বলতে-বলতে বাবা আমার মাথায় আর পিঠে হাত বোলাত।

বাবার তিন পৃষ্ঠার সুইসাইড নোট পড়ার পর থেকে পুরোনো কথা আরও বেশি করে মনে পড়ছে।

মারা যাওয়ার মাসচারেক আগে একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে বাবা হঠাৎ বলল, 'আমাদের কোম্পানি এবার বোধহয় রোবটের জন্যে সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপ করবে। রীতেশদা আমাকে খুব প্রেশার দিচ্ছেন। বলছেন, রোবটের সফ্‌টওয়্যারে আমার যা স্কিল তাতে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই এই লাইনে মেজর রোল প্লে করতে পারব। আমাকে পেটেন্টগুলো দেওয়ার জন্যে বলছিলেন....।'

মা বলল, 'সেটা খারাপ কী! তোমার ব্যবসা বড় হলে তুমি আরও বেশি টাকা পাবে সেটা বড় কথা নয়। তোমার সুনাম হবে, তোমাদের কোম্পানি বিখ্যাত হবে, সেটাও কম নয়। আমার মনে হয়, রীতেশদা ঠিকই বলছেন।'

আমি বললাম, 'টিভিতে কোনও সময় রোবোটিক সফ্‌টওয়্যার রিসার্চ নিয়ে আলোচনা হলেই সবাই তোমার নাম বলে। তখন আমার খুব ভাল্লাগে, বাবা। তুমি যদি রীতেশ জেঠুর কথা শোনো তা হলে তোমার আরও নাম হবে, তখন তোমাকে হলো-টিভিতে দেখাবে। আমার ভীষণ ভাল্লাগবে, বাবা।'

মুখে একগ্রাস ভাত পুরে দিয়ে বাবা কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'ঠিক আছে—দেখি...।'

বেশ মনে আছে, তার পর থেকেই রীতেশ জেঠু যেন একটু ঘন-ঘন আমাদের বাড়িতে আসা শুরু করলেন। কখনও তিনি একা আসতেন, কখনও ওঁর ফেবারিট একজন কি দুজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। অবশ্য সেই ইঞ্জিনিয়াররা বাবারও ফেবারিট ছিল।

ওঁরা যখন কথা বলতেন তখন আমি বা মা সেখানে যেতাম না। কারণ, বুঝতেই পারতাম, ওঁরা অফিসের কাজকর্ম নিয়ে বাবার সঙ্গে অফিশিয়াল কিংবা টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলছেন।

আমি বই নিয়ে বসে ক্লাস টুয়েল্‌ভ-এর পড়া তৈরি করতাম। আর কম্পিউটার সাবজেক্টটা শুধু মন দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে পড়তাম। কারণ, আমিও চাইতাম, বাবার স্বপ্নটা সত্যি হোক। 'আলট্রা সফ্‌টওয়্যার'-কে আমি যেন মাটি থেকে আকাশে নিয়ে যেতে পারি।

●

একদিন সন্ধেবেলা বাবা, রীতেশ জেঠু আর উমেশ সকসেনা নামে ওঁদের কোম্পানির একজন ইঞ্জিনিয়ার ড্রইংরুমে বসে কথা বলছিল। হঠাৎই বাবার উঁচু গলা পেলাম।

আমি ই-বুক রিডারে ফিজিক্স পড়ছিলাম—ফেমটো-টেকনোলজির ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে একটা চ্যাপ্টার। কিন্তু বাবার উঁচু গলা কানে যেতেই মনোযোগ নড়ে গেল।

শুনতে পেলাম বাবা বলছে, '...পেটেন্টগুলো তো আমার পারসোনাল, রীতেশদা। যদি আমাদের কোম্পানি ওগুলোর রাইট কিনে নেয় তা হলে তো আর কোনও প্রবলেম নেই। আমরা ওগুলো ইউজ করব, তারপর প্রফিট আর্ন করব—যার-যার প্রফিটের শেয়ার বুঝে নেব—তাই না? এর মধ্যে তো কোনও ইফ্‌স অ্যান্ড বাট্‌স নেই। সিম্প্‌ল।'

রীতেশ জেঠু তখন বলছেন, 'তুমি তো কোম্পানির অবস্থা খুব ভালো জানো, কিরণ। আমাদের হাতে প্রচুর অর্ডার, কিন্তু এক্সিকিউট করার টাকা নেই। এ অবস্থায় আমাদের লোন নিয়ে হোক, যে-করে-হোক, অর্ডারগুলো অনার করতে হবে। তার ওপর যদি তোমাকে এক্ষুনি পেটেন্টের রাইট নেওয়ার রেমুনারেশান দিতে হয়, তা হলে তো সাংঘাতিক অবস্থা হবে! তার চেয়ে আমার এই সাজেশানটা কি বেটার না?

'যে তুমি পেটেন্টের রাইট "আলট্রা সফ্‌টওয়্যার"-কে দিয়ে দাও। তার বদলে এসো, তোমার আমার পার্টনারশিপ ডিড ফিফটি-ফিফটি থেকে নতুন করে ফর্টি-সিক্সটি পার্সেন্ট বানিয়ে নিই। মানে, ফর্টি আমার, সিক্সটি তোমায়। কিরণ, প্লিজ লিস্‌ন টু মি। আমাদের কোম্পানির এখন যা অবস্থা তাতে শুধু কিছু ইনপুট দরকার—তা হলেই ফ্যাবিউলাস আউটপুট পাবে তুমি। গ্লোবাল ম্যাপে "আলট্রা সফ্‌টওয়্যার" উইল বিকাম আ ব্রাইট স্পট। প্লিজ, আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো, কিরণ। আমি শুধু আমার জন্যে এ-রিকোয়েস্ট করছি না—দিস ইজ ফর আওয়ার সেক।'

আমি পড়ার টেবিল ছেড়ে ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার পাশ থেকে সাবধানে মাথা বাড়িয়ে উঁকি মেরে বাবাকে আর উমেশ সকসেনাকে দেখতে পেলাম। তবে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা জুপিটারের শরীরে সকসেনার খানিকটা অংশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

আমি আরও খানিকটা মাথা বাড়াতেই রীতেশ জেঠুকে দেখতে পেলাম। বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন, মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে বসে আছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রীতেশ জেঠু মুখ তুললেন।

'কিরণ, য়ু আর আ রোবোটিক সফ্‌টওয়্যার জিনিয়াস—য়ু নো দ্যাট? তোমার কাছে আমি যা চাইছি সেটা শুধু সময়। তোমাকে পেটেন্টের রেমুনারেশান পেমেন্টের ব্যাপারে তুমি শুধু আমাদের কোম্পানিকে কিছু সময় দাও। আমাদের তো পার্টনারশিপ কোম্পানি—তোমার টাকা না দিয়ে আমি কী ভাবে পালাব? কোথায় পালাব?

'জাস্ট থিংক ইট ওভার। আমি তোমার কনসেন্ট পাব ভেবে সকসেনাকে সঙ্গে এনেছিলাম। ও তোমার কাছ থেকে সফ্‌টওয়্যার প্যাকগুলো বুঝে নেবে। তারপর কাল থেকে ও তোমার অ্যাসোসিয়েট হয়ে কাজ করবে। হি উইল অ্যাসিস্ট য়ু অল দ্য টাইম। তারপর... তারপর...আফটার আ কাপ্‌ল অফ মান্‌থ্‌স...উই উইল বিকাম দ্য লিডিং রোবোটিক সফ্‌টওয়্যার কোম্পানি অন দিস প্ল্যানেট—ওহ্‌ বয়! ক্যান য়ু ইমাজিন!'

সকসেনা এবার মুখ খুলল, বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার কাছে থেকে আমাকে রোবোটিক সফ্‌টওয়্যার শেখার চান্স দিন—প্লিজ। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় রোবোটিক্স আমার স্পেশাল পেপার ছিল। প্লিজ, স্যার—।'

সকসেনার মাথায় কোঁকড়ানো চুল, পুরু ভুরু, আর দু-গালে ব্রণের দাগ। ওর চেহারা দেখে আমার ভালো লাগছিল না।

বাবা দেখলাম কেমন চিন্তায় পড়ে গেল। একবার সকসেনার, আর-একবার রীতেশ জেঠুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, 'ও. কে., রীতেশদা—আমাকে ক'টা দিন ভাববার সময় দিন।'

'ও. কে.—।' রীতেশ জেঠু বললেন।

'রীতেশদা, অ্যাটমসফিয়ার বড্ড সিরিয়াস হয়ে গেছে—এটাকে হালকা করা যাক। আসুন, এক রাউন্ড কফি খাওয়া যাক। সুকি আর আমার মিসেসকে ডাকি—সবাই মিলে একটু গল্প-টল্প হোক।'

কথাটা শেষ করেই বাবা আমাকে আর মা-কে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল।

তো আমরা জড়ো হয়ে গেলাম। একটা লম্বা সোফায় আমি আর মা ভাগাভাগি করে বসে পড়লাম।

রীতেশ জেঠু মা-কে লক্ষ করে হেসে বলল, 'বোনটি আমার, তোমার জিনিয়াস হাজব্যান্ডকে একটু ভালো করে বোঝাও। আমার কথা শুনলে কিরণেরও ভালো হবে, সুকিরণেরও ভালো হবে। আর আমাদের কোম্পানির ভালো হওয়া মানে আমারও ভালো হওয়া....।' কথা শেষ করে খোলা মনে হেসে উঠলেন রীতেশ জেঠু।

জুপিটার হঠাৎ বাবার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'স্যার, ক' কাপ কফি আনব যদি কাইন্ডলি বলেন...।'

জুপিটারের এ-কথা বলার কারণ আছে। উমেশ সকসেনা আগে দু-চারবার আমাদের বাড়িতে এলেও শুধু চা খেয়েছে—কফি খায়নি।

আর আমি কখনও কফি খাই, কখনও চা খাই—ঠিকঠাক কোনও নিয়ম নেই। সেইজন্যেই জুপিটারের নলেজ বেস হোঁচট খেয়েছে।

বাবা বলল, 'যাও, পাঁচ কাপ নরমাল কফি নিয়ে এসো—।'

জুপিটার চলে গেল। রীতেশ জেঠু ওর চলে যাওয়া দেখতে লাগলেন।

ওর হাঁটা-চলায় সামান্য একটা হ্যাঁচকা ভাব আছে। কোনও ইনডোর রোবটেরই চলাফেরা মানুষের মতো মসৃণ নয়। বাবা বলেছে, সেই ধরনের ফ্লুইড লোকোমোশান স্টাইলে পৌঁছতে টেকনোলজির এখনও অন্তত আট-দশ বছর লাগবে।

জুপিটারকে দেখতে অবিকল মানুষের মতো। শুধু গলা, কনুই, কবজি, হাঁটু, গোড়ালি—এসব জায়গায় জয়েন্টের একটু ফাঁক আছে। আর সরকারি আইন অনুযায়ী ওদের বাঁ-হাতের সামনের অংশ—কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত—ইস্পাতের তৈরি। উঁহু, ঠিক হল না। বরং বলা ভালো, ওই অংশটুকুর ইস্পাত দেখা যায়। কারণ, এই ধরনের রোবটের সর্বাঙ্গ ইস্পাতের তৈরি। তবে ওদের ইস্পাতের শরীর নকল টিস্যু আর চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে—অ্যান্ড্রয়েডদের মতো। হুবহু মানুষের মতো দেখতে অ্যান্ড্রয়েড তৈরি করাটা আমাদের দেশে বেআইনি। তাই ইচ্ছে করেই জুপিটারদের বাইরের চেহারায় 'ডিফেক্ট' রাখা হয়। আর বাঁ-হাতের ইস্পাতের অংশটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর আইন এই কারণে যে, কিছুতেই যেন রোবটকে কেউ মানুষ বলে ভুল না করে।

জুপিটারকে দেখতে-দেখতে রীতেশ জেঠু বাবাকে জিগ্যেস করলেন, 'কিরণ, তোমার এই যন্ত্রটা ঠিকঠাক সারভিস দিচ্ছে তো?'

একটু অবাক হয়ে বাবা বলল, 'হ্যাঁ, দিচ্ছে। কেন বলুন তো?'

'না, মানে আমার বাড়িরটা মাঝে-মাঝে প্রবলেম করে। আমার ওয়াইফ অর্ডার দিলে শোনে, কিন্তু আমি কোনও ফরমাশ করলে সেটা গ্রাহ্য করে না।'

মা রসিকতা করে বলল, 'ডোমেস্টিক রোবটও বুঝে গেছে বাড়িতে আসল বস কে।'

এ-কথায় বাবা আর রীতেশ জেঠু হেসে ফেললেন। উমেশ সকসেনাও দেখলাম, মুখ আড়াল করে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

বাবা রীতেশ জেঠুকে জিগ্যেস করল, 'ইয়ারকি মারছেন, না মেশিনটা সিরিয়াসলি প্রবলেম করছে?'

'সিরিয়াসলি প্রবলেম করছে।'

'তা হলে আমার ভয়েস রিকগনিশান সফ্‌টওয়্যারটা আপনার মেশিনে অ্যাক্টিভেট করে দেব। শুধু সেন্সর আর অ্যাডিশন্যাল হার্ডওয়্যারটুকু কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।'

'ওটা রায়চৌধুরি করে দিতে পারবে, স্যার।' উমেশ সকসেনা বলল।

রীতেশ জেঠু কপালে ভাঁজ ফেলে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা কিরণ, তোমার এই রোবটটার ভেতরে থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স ইনস্টল করা আছে তো?'

'অফ কোর্স আছে, রীতেশদা। এটা তো রোবট ইন্ডাস্ট্রির জন্যে গভর্নমেন্টের ম্যান্ডেটরি রুল। এই তিনটে সূত্রের নিয়ম না মানলে কোম্পানিকে চিরকালের জন্যে ব্যবসা গোটাতে হবে। দশ-বারো বছর আগেও সরকারি নিয়মটা ঢিলেঢালা ছিল, কিন্তু লাস্ট টেন ইয়ার্সে এই থ্রি ল'জ-এর রুল ভায়োলেট করার জন্যে অন্তত তেত্রিশটা কোম্পানিকে ঝাঁপ বন্ধ করতে হয়েছে। এর জন্যে লম্বা ট্রায়ালের কোনও ব্যাপার নেই। অর্ডিনান্স এনফোর্স করে সুপারফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিসিশান। ওরে ব্বাবা! থ্রি ল'জ সাংঘাতিক ভাইটাল ব্যাপার—।'

এই থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স-এর ব্যাপারটা আমি জানি। বাবা-ই আমাকে বহুবার এই সূত্রগুলোর কথা বলেছে।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে, একজন বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশান লেখক তাঁর 'রানঅ্যারাউন্ড' নামে একটা গল্পে এই তিনটে সূত্রের কথা প্রথম বলেছিলেন। সেই লেখকের নাম আইজ্যাক অ্যাসিমভ। আর গল্পটা তিনি লিখেছিলেন ১৯৪২ সালে।

সেই সূত্র তিনটে হল ঃ

প্রথম সূত্র ঃ রোবট কখনও কোনও মানুষের
ক্ষতি করবে না, অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনও
মানুষের পরোক্ষ ক্ষতির কারণ হবে না।
দ্বিতীয় সূত্র ঃ রোবট সবসময় মানুষের নির্দেশ
পালন করবে, যদি না সেই নির্দেশ প্রথম সূত্রের
পরিপন্থী হয়।
তৃতীয় সূত্র ঃ রোবট সবসময় নিজেকে রক্ষা
করার চেষ্টা করবে, যদি না সেই চেষ্টা প্রথম
এবং দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী হয়।

এই সূত্রগুলো এমনই যে, একেবারে গল্পের পৃষ্ঠা থেকে আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স আর রোবোটিক্স-এর গবেষণার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর শুধু ঢুকেই পড়েনি, একেবারে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে।

এমন সময় জুপিটার কফি নিয়ে এল।

কফি খেতে-খেতে আমরা গল্পগুজব করতে লাগলাম। রোবট আর রোবোটিক্স নিয়ে অনেক কথাই হতে লাগল যার বেশিরভাগটাই আমার আর মায়ের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আড্ডাটা আমরা এনজয় করছিলাম।

কথা বলতে-বলতে বাবা হঠাৎ করে মগজেন্দ্রর কথা তুলল।

মা আর বাবার কাছ থেকে ওর নানান কথা আমি আগে অনেকবার শুনেছি। ওর কথা আমার নিজেরও বেশ খানিকটা মনে আছে।

মগজেন্দ্র বাবার তৈরি প্রথম পরীক্ষামূলক রোবট। এর ডিজাইন বাবার হলেও হার্ডওয়্যার পার্টটা তৈরি করে দিয়েছিল বাবার চেনা একটা ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।

এই ডোমেস্টিক রোবটটা বাবা তৈরি করেছিল প্রায় পনেরো বছর আগে। আমি তখন খুব ছোট। বলতে গেলে আমার দেখাশোনার জন্যেই বাবা রোবটটা তৈরি করেছিল। আজকালকার যুগে এই রোবট অচলের চেয়েও কিছু বেশি।

তখন আমরা কলকাতায় আসিনি। আমরা থাকতাম বর্ধমানের এক গণ্ডগ্রাম পাটুলিতে। বাবা কলকাতায় একটা সফ্‌টওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করত। রোজ পাটুলি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত। আর মা বাড়িতে টিউশন পড়াত—বাড়তি আয়ের জন্যে।

জ্ঞান হয়ে থেকেই দেখেছি বাবা সবসময় কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে, রাত জেগে রোবট নিয়ে পড়াশোনা করছে, রোবটের কতরকম নকশা তৈরি করছে।

বেশ মনে আছে, বাবা আমাকে কয়েকটা অটোমেটিক খেলনা তৈরি করে দিয়েছিল। সেগুলো ব্যাটারিতে দিব্যি চলে-ফিরে বেড়াত। পরে বুঝেছি, সেগুলো ছিল মগজেন্দ্রকে তৈরি করার প্রস্তুতিপর্ব।

রোবটটার 'মগজেন্দ্র' নামটা দিয়েছিল বাবা। কিন্তু ওর মগজ মোটেই ধারালো ছিল না। ওর চেহারা ছিল যেমন কিম্ভূতকিমাকার, তেমন বুদ্ধিও ছিল হাফ-উইটদের মতো। আর ওর ব্যাটারি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অটোমেটিক রিচার্জ হত।

ওকে কখনও কোনও সূত্রের কথা বললেই ও শুধু আইজাক নিউটনের তিনটে সূত্র গড়গড় করে আউড়ে যেত। যেন ওগুলোই

ওর রোবটজীবনের মূলমন্ত্র।

মা নাকি ঠাট্টা করে বাবাকে বলত, 'ওর নামটা মগজেন্দ্র থেকে পালটে বোকাচন্দ্র করে দাও...।' আর আমি ওর মগজেন্দ্র নামটা উচ্চারণ করতে পারতাম না—তাই ওকে ছোটবেলায় 'গজমেন্দ্র' বলে ডাকতাম। এ নিয়ে মা আর বাবা প্রবল হাসাহাসি করত।

সে যাই হোক, মগজেন্দ্র সবসময় আমার কাছে-কাছে থাকত, আমার সঙ্গে খেলত, আমি পড়ে গেলে আমাকে ধরত, আর আমার লেখাপড়ায় যথেষ্ট হেল্প করত।

আমার বইয়ের পড়া মগজেন্দ্র চট করে মুখস্থ করে নিত। তারপর সেই পড়া আমার কানের কাছে বারবার মুখস্থ বলার জন্যে ওকে ইনস্ট্রাক্ট করতাম। ওর সেই মুখস্থ কয়েকবার শুনলেই আমার পড়া তৈরি হয়ে যেত।

তা ছাড়া মগজেন্দ্র বোধহয় আমাকে ভালোও বাসত।

ছোটবেলায় বাবা-মা আমাকে 'বাবু' বলে ডাকত। তার দেখাদেখি মগজেন্দ্রও আমাকে 'বাবু' বলে ডাকত। বাবাকে ও বলত 'বড়বাবু'। আর মা-কে 'মা'!

জুপিটার জি-টুয়েন্টি মগজেন্দ্রর তুলনায় অনেক আধুনিক। রোবট টেকনোলজি গত পনেরো বছরে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়েছে—এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশানের মতো। এই মুহূর্তে তারই চুড়োয় বসে আছে আমাদের জুপিটার। বাবাকে ও 'স্যার' বলে, মা-কে 'ম্যাডাম', আর আমাকে 'জুনিয়ার'। ওর ব্রেন যেমন আলট্রামডার্ন, নলেজ বেসও সাংঘাতিক। জুপিটার জানে না হেন জিনিস নেই। ও সাইবার স্পেস থেকে সবসময় নিজেকে আপগ্রেড করে। এককথায় জুপিটার হল চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া। সেইজন্যেই ও আমার পড়াশোনায় দারুণভাবে হেল্প করতে পারে। মগজেন্দ্রর পক্ষে এইরকম সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব ছিল না।

মগজেন্দ্রর কথা আমাদের মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে, কারণ, ফেলে আসা পুরোনো বাড়িটার কথা আমরা মাঝে-মাঝে ভাবি। আবার এর উলটোটাও সত্যি। মগজেন্দ্রর কথা মনে পড়ে বলেই পাটুলির বাড়িটার কথা আমাদের মনে পড়ে যায়।

আমাদের পাটুলির বাড়িতে কতবছর যে যাওয়া হয় না!

আমি আর মা ও-বাড়ি ছেড়ে আসার পর আর একদিনও যাইনি। সে প্রায় দশবছর হল।

বাবা চারবছর আগে পাটুলির বাড়িতে একবার গিয়েছিল—ফেলে আসা কয়েকটা জরুরি ড্রইং আর মাইক্রোসিডি নিয়ে আসতে।

ফিরে এসে বাবা বলেছিল, 'আমাদের বাড়িটা কেমন পোড়োবাড়ির মতো দেখতে হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে গিয়ে থেকে এলে হত...।'

মা উত্তরে বলেছিল, 'কী করে যাবে, বলো! তোমার এই অসহ্য কাজের চাপ। তার ওপর সুকির পড়াশোনা...।'

না, আমাদের আর যাওয়া হয়নি।

●

মারা যাওয়ার আগে প্রায় একমাস বাবাকে ভীষণ অস্থির দেখেছি। অনেক দরকারি কথা মনে রাখতে পারত না। অনেক সহজ কাজ করতে গিয়ে ভুল করে ফেলত। প্রায়ই অফিস কামাই করত। বাড়িতে আমার কাছে বা মায়ের কাছে বসে থাকত। আবার কখনও বা মা-কে আর আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসত।

এসব দেখে আমার কেন জানি না মনে হত বাবা বাড়িতে আরও বেশি করে সময় দিতে চাইছে।

সেই একমাসে বাবা বেশ কয়েকবার বলেছিল, 'চল, আমরা পাটুলির বাড়িতে সাতদিন থেকে আসি—।'

তখন আমি আপত্তি করে বলেছি, 'কী করে এখন যাই বলো তো! সামনে তো পরীক্ষা!'

শুনে বাবা কেমন উদাস হয়ে বলেছে, 'ও হ্যাঁ, পরীক্ষা। ভালো করে পড়। পরীক্ষা যেন ভালো হয়। মনে রাখিস, সুকিরণকে কিরণের ওপরে যেতে হবে...।' তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

তখন বুঝিনি বাবা মনে-মনে চরম খারাপ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে।

বাবার তিন পৃষ্ঠার সুইসাইড নোট পড়ে আমি আর মা সব বুঝতে পেরেছিলাম। বাবার অকালে চলে যাওয়ার মূলে ছিল একটাই মানুষ। তার নাম রীতেশ বসাক।

সুইসাইড করার মোটামুটি একমাস আগে একদিন সন্ধ্যায় বাবা হঠাৎই অফিসের একটা ফাইল খুলে ভীষণ চমকে যায়। সেই ফাইল থেকে বাবা প্রথম জানতে পারে, 'আলট্রা সফ্টওয়্যার' যে-ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে নানান সময়ে ষোলো লক্ষ টাকা লোন নিয়েছে সেটার নাম 'এস. বি. ফিন্যান্স' আর তার মালিকের নাম সুমিতা বসাক—রীতেশ বসাকের স্ত্রী। যে-লোনটা নেওয়া হয়েছিল টুয়েন্টি-টু পার্সেন্ট অ্যানুয়াল ইন্টারেস্টে সেটা কাগজে লেখা রয়েছে ফর্টি-টু পার্সেন্ট।

কী করে যে কাগজপত্র পালটে গেল সেটা বাবার মাথায় ঢোকেনি। সফ্টওয়্যারের টেকনিক্যাল দিক নিয়ে বাবা এতই মেতে ছিল যে ফিন্যান্সের দিকটায় আর ঠিকঠাক নজর রাখতে পারেনি।

বাবা সরাসরি রীতেশ জেঠুর চেম্বারে গিয়ে ফাইলটা দেখায় এবং ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করে।

রীতেশ জেঠু সিগারেট খাচ্ছিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন।

'বোসো, কিরণ। অত একসাইটেড হোয়ো না। বোসো।'

বাবা বসে পড়ল। রীতেশ জেঠুর মুখের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রইল।

'শোনো, কিরণ—ফিন্যান্সের পেপার্স-টেপার্স তো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট দ্যাখে। তুমি আমাদের অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার আর. পি. চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো। তবে কাগজে কি আর ভুল লেখা থাকবে?'

বাবা উত্তেজনা চাপতে না পেরে জিগ্যেস করল, 'সুমিতা বসাক আপনার ওয়াইফ?'

'হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?' ভুরু কপালে তুললেন রীতেশ : 'আমার ওয়াইফ বলেই তো প্রপার সিকিওরিটি আর কোল্যাটারাল সিকিওরিটি ছাড়াই এত টাকা লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে—।'

'তা বলে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট! দিনের পর দিন ইন্টারেস্ট তো চড়চড় করে বাড়ছে!'

আবার সিগারেটে টান দিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে হাত-পাখা নেড়ে মুখের কাছ থেকে ধোঁয়ার জাল ফিকে করলেন : 'দ্যাখো, কিরণ—ইন্টারেস্ট যতই বাড়ুক আমি ভয় পাই না। তোমার কাছে যেসব পার্সোনাল অ্যাসেট আছে তার দাম কয়েক কোটি টাকা...তাই না?'

'কী পার্সোনাল অ্যাসেট?'

সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন। বাবার চোখে সরাসরি তাকালেন। পাখির পালকে আদরের আঙুল চালানোর মতো নিজের সাদা দাড়িতে আঙুল চালালেন। তারপর আলতো হেসে বললেন, 'তোমার সম্পত্তির খবর তুমিই রাখো না! তোমার অ্যাসেট হল তোমার তৈরি সফ্টওয়্যার প্যাকেজ আর পেটেন্ট। সেগুলো তুমি "এস. বি. ফিন্যান্স"-কে দিয়ে দাও, সব লোন শোধ হয়ে যাবে। এখন টোটাল লোন অ্যামাউন্ট হচ্ছে...।' ড্রয়ার থেকে ছোট্ট একটা অপটিক্যাল কম্পিউটার বের করে দু-একটা বোতাম টিপলেন। তারপর : 'এখন টোটাল লোন অ্যামাউন্ট হচ্ছে ফর্টি-ফাইভ ল্যাক সামথিং। এটা শোধ হওয়া কোনও ব্যাপার নয়—সে আমি সুমিতাকে বলে দেব...।'

এ-কথা শুনে বাবা টেবিল থেকে একটা মেটাল পেপারওয়েট তুলে রীতেশ বসাককে ছুড়ে মারতে যায়। তখন রীতেশ একটা চকচকে অটোমেটিক মেশিন পিস্তল কোথা থেকে যেন বের করে বাবার নাকের ডগায় ঠেকিয়ে ধরেছেন।

এবং চিবিয়ে-চিবিয়ে নীচু গলায় বলেছেন, 'কিরণ, তুমি আমার বন্ধু এবং পার্টনার। তাই পুলিশ ডাকছি না। তবে বুঝতেই পারছ—তুমি যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট—য়ু হ্যাভ নো চয়েস। সো য়ু প্লে মাই বল গেম।'

শুকনো লঙ্কা বাটা গায়ে মাখলে যেমন হয়, অপমানের জ্বালায় বাবা সেরকম জ্বলছিল। সিকিওরিটি গার্ডরা বাবাকে সঙ্গে করে অফিসের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর গাড়িতে তুলে দিয়েছিল।

তবে সেটা নাকি মোটেই বাবাকে অপমান করার জন্যে নয়—বরং বাবার সুরক্ষার জন্যে রীতেশ গার্ডদের ডেকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

সেই দিনটাই ছিল বাবার কাছে শেষের শুরু।

তারপর একমাস ধরে আমরা দেখেছি, ধীরে-ধীরে শেষটা কেমন করে বাবার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে।

এসব কথা বাবা আমাকে বা মা-কে কখনও বলেনি। সমস্ত ব্যথা আর অপমান বুকে চেপে রেখে মানুষটা একমাস ধরে কষ্ট করেছে। তারপর সব কষ্ট নষ্ট করার পথ বেছে নিয়েছে।

বাবা মারা যাওয়ার পর রীতেশ জেঠু বড়জোর সাত-আট দিন চুপচাপ ছিলেন। তার পর থেকেই নিয়মিত ফোন করা শুরু করেছেন।

রীতেশ ফোন করলে বাবার মোবাইলেই করতেন। কারণ, বাবার শ্রাদ্ধের পর নিয়মভঙ্গের অনুষ্ঠানে তিনি যখন এসেছিলেন তখন মা বলেছিল যে, বাবার মোবাইল ফোনটা এখন থেকে মা-ই ব্যবহার করবে।

এর কারণটা মা আমাকে খুলে না বললেও আমি বুঝেছিলাম। মা বাবার ছোঁয়ার ছোঁয়া পেতে চায়।

প্রথম-প্রথম রীতেশ জেঠু ফোন করে খুব ভদ্রভাবে কথা বলতেন। দু-তিনবার আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। আমার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো কথা বলেছেন। বাবার আকস্মিক মৃত্যু যে 'আলট্রা সফটওয়্যার'-এর পক্ষে বিরাট লস সে-কথা আক্ষেপ করে বারবার বলতেন।

আমরা লোকটাকে চিনে ফেললেও মুখে সে-কথা প্রকাশ করিনি।

তারপর একদিন সন্ধেবেলা অচেনা একটা লোককে সঙ্গে করে রীতেশ জেঠু আমাদের বাড়িতে এলেন।

সঙ্গের লোকটাকে দেখে আমার ভালো লাগল না। বেশ লম্বা, রোগা, চোয়াড়ে মুখ-চোখ, গালে চাপদাড়ি, আর মাথার সব চুল কালো হলেও বাঁ-কানের কাছে এক গোছা চুল পাকা।

রীতেশ জেঠু লোকটার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ও হচ্ছে আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট—জনার্দন সাহা। কিরণ ওকে খুব স্নেহ করত—।'

ড্রইংরুমে বাবার একটা বিশাল ফটো টাঙানো ছিল। জনার্দন সেদিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করল।

মা চা আর স্ন্যাক্স-এর ব্যবস্থা করেছিল। জুপিটার সেগুলো পরিবেশন করল।

চা খেতে-খেতে রীতেশ জেঠু এতদিন পর খোলস ছেড়ে বেরোলেন।

'মিসেস রায়—' মা-কে লক্ষ করে নরম গলায় বললেন, 'কিরণ চলে গেছে তো একমাসের ওপর, এবারে একটু আমাদের ব্যবসার কথাটা ভাবা যাক।'

রীতেশ জেঠুর 'মিসেস রায়' সম্বোধনটা আমার কানে লাগল। কারণ, বরাবর রীতেশ জেঠু মা-কে হয় নাম ধরে নয় তো মজা করে 'বোনটি আমার' বলে ডাকতেন।

ব্যাপারটা যে মায়েরও কানে লেগেছে সেটা মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্তত করে আবার বলতে শুরু করলেন রীতেশ বসাক। এবার তিনি ভাববাচ্যে কথা বলছিলেন।

'কোম্পানিতে আমাদের লোনের চাপ এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় সাতচল্লিশ লাখ টাকা। তার মানে কিরণের ভাগে পড়ল প্রায় সাড়ে তেইশ লাখ টাকা। এ টাকাটা তো এখন শোধ দিতে হবে। তা ছাড়া টাকাটা রোজই সুদে বাড়ছে—ফর্টি-টু পার্সেন্ট পার অ্যানাম...।'

মা পাথরের মতো মুখ করে রীতেশ জেঠুর কথা শুনছিল। আমিও তাই।

রীতেশ জেঠুকে কখনও আমরা বাবার তিন পৃষ্ঠার সুইসাইড নোটটার কথা বলিনি। বলার প্রশ্নই ওঠে না। ওটার কথা আমি আর মা ছাড়া কেউ জানে না।

সুতরাং রীতেশ জেঠু কেমন করে জানবে, বাবা মারা যাওয়ার আগে ওঁর চালাকি আর কুকীর্তির কথা সব আমাদের ডিটেইলে জানিয়ে গেছে!

রীতেশ তখনও বলে চলেছেন, '...আমি জানি, টাকাটা এক্ষুনি শোধ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা...ইয়ে সাজেশান...দিতে পারি...।'

'কী সাজেশান?' জুপিটারের মতো যান্ত্রিক স্বরে মা জিগ্যেস করল।

'কিরণের তৈরি সফ্টওয়্যার আর পেটেন্টগুলোর রাইট পেয়ে গেলে সাড়ে তেইশ লাখ টাকার লোনটা আমি শোধ করে দিতে পারতাম...।'

মা ঠান্ডা গলায় বলল, ' ''এস. বি. ফিন্যান্স''-এর মালিক—মানে, আপনার ওয়াইফ কি এই সাজেশানই দিয়ে পাঠিয়েছে?'

ঘরে এ. সি. চলছিল। মায়ের কথায় মনে হল শীতটা অনেক বেড়ে গেল।

রীতেশ জেঠুর ফরসা মুখে পলকে আবির ছড়িয়ে পড়ল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরলেন। তারপর পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করলেন। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে লাইটারে 'ক্লিক' শব্দ করে সিগারেট ধরালেন। তাতে কয়েকটা টান দিয়ে চোখ ছোট করে মা-কে লক্ষ করে সিগারেটের ধোঁয়ার জেট ছুড়ে দিলেন।

'অনেক খবরই জানা হয়ে গেছে দেখছি!' রীতেশ বললেন। জনার্দন সাহার দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন।

অমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। রাগে গা রি-রি করছিল।

রীতেশ জেঠু আগে কখনও মায়ের সামনে সিগারেট ধরাননি। এমন অসভ্যের মতো ধোঁয়া ছাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া এ. সি চললে সিগারেট না ধরানোটাই রেওয়াজ।

মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে বসল।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এসব কী হচ্ছে!'

মা ঘেন্না মেশানো গলায় হিসহিস করে বলল, 'এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে চলে যান...এক্ষুনি...প্লিজ...।'

রীতেশ হাসলেন। সিগারেটে প্রবল টান দিয়ে জনার্দন সাহার দিকে তাকিয়ে আবার ইশারা করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে আরামের নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'এটাও কেউ বোঝে না যে, এই বাড়িটা এখন বলতে গেলে ''এস. বি. ফিন্যান্স''-এর—মানে, আমার ওয়াইফের। সে যদি লোন রিকভার করতে চেয়ে কোর্টে কেস করে তা হলে তো খুব বাজে ব্যাপার হবে। কিরণ রায়ের নামে কালি লাগবে। তার সঙ্গে কোম্পানির ক্যাপিটাল নক্কা-ছক্কা করার অ্যালিগেশান আসবে। এ-বাড়ির লোকজনকে নিয়ে পুলিশ টানাহ্যাঁচড়া করবে। তার ওপর আমি কলকাঠি নাড়লে হয়তো দু-চারদিন জেলের ভাতও খেতে হতে পারে...।'

'আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান!' মা গলা তুলে বলল।

রীতেশ বসাক এ-কথার উত্তরে মায়ের মুখ লক্ষ করে আবার ধোঁয়া ছুড়ে দিলেন।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

এক ঝটকায় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, অন্ধ রাগে রীতেশ বসাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলাম।

কিন্তু তার আগেই আমার হাত-পা আচমকা ঠান্ডা হয়ে গেল।

কারণ, জনার্দন ওর পকেট থেকে একটা ছোট রিভলভার বের করে টেবিলের ওপরে ঠকাস করে রেখেছে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ভয়ে মায়ের চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে। আতঙ্কের একটুকরো আর্তনাদও বেরিয়ে এল মায়ের মুখ থেকে।

রীতেশ বসাক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ওপরদিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, 'এটা একটা সফ্‌ট ওয়ার্নিং—।'

জুপিটার একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল, আমাদের কথা শুনছিল।

আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'জুপিটার,

রিভলভারটা শিগগির তুলে নাও!'

জুপিটার যে এত সাংঘাতিক ক্ষিপ্রতায় কাজ করতে পারে, সেটা আমি কোনওদিন কল্পনাও করিনি।

ও বিদ্যুৎগতিতে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। ওর ইস্পাতের বাঁ-হাত টেবিলে রাখা রিভলভারটা লক্ষ্য করে ছোবল মারল।

কিন্তু ওর কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড দেরি হয়ে গেল। ও রিভলভার মুঠো করে চেপে ধরার আগেই রীতেশ বসাক ওটাকে চেপে ধরেছেন। ফলে জুপিটারের হাত চেপে বসেছে রীতেশের হাতের ওপর। ওঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়েছে টেবিলে। ওটা থেকে ধোঁয়ার রেখা উঠে যাচ্ছে ওপরে।

'হাতটা গুঁড়িয়ে দাও, জুপিটার!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কিছুতেই ছাড়বে না! কিছুতেই না।'

জুপিটার আমার কথা শুনতে চাইল। রীতেশের হাতের ওপর চাপ বাড়াল।

জনার্দন লাফিয়ে এসে জুপিটারের হাতের বাঁধন ছাড়ানোর জন্যে ওর লোহার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। 'ছাড়! ছাড়!' বলে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু জুপিটার সেসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না।

মা আর থাকতে পারল না। রীতেশ জেঠুর দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'শয়তানটাকে ছাড়বি না, জুপিটার! এই লোকটা আমাদের জীবন ছারখার করে দিয়েছে। নোংরা ছোটলোক কোথাকার!'

যখন আমি আর মা জুপিটারের কাণ্ডকারখানায় মহাখুশি ঠিক তখনই রীতেশ জেঠু যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করলেন।

আমাদের খুশির মাত্রাটা আরও কয়েক ধাপ ওপরে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু জুপিটার এবার যা করল তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

রীতেশ বসাকের হাতটা ও ছেড়ে দিল।

আমি হোঁচট খাওয়া গলায় বললাম, 'কী করছ, জুপিটার? এ কী করছ?'

'সরি, জুনিয়ার। "সেকেন্ড ল' অফ রোবোটিক্স।" ' জুপিটার যান্ত্রিক গলায় বলল, 'তোমাকে কি মনে করিয়ে দেব? "রোবট সবসময় মানুষের নির্দেশ পালন করবে, যদি না সেই নির্দেশ প্রথম সূত্রের পরিপন্থী হয়।" আর প্রথম সূত্র বলছে, "রোবট কখনও কোনও মানুষের ক্ষতি করবে না..." এট্সেট্রা-এট্সেট্রা...।'

জুপিটারের কথায় আমার কান্না পেয়ে গেল। হতচ্ছাড়া থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স!

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তাকিয়ে দেখি মায়ের চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে নামছে।

রীতেশ জেঠু বাঁ-হাত দিয়ে ডানহাতের পরিচর্যা করছিলেন। আর একইসঙ্গে বাঁকা হাসি হাসছিলেন।

'সুকিরণ, মডার্ন টেকনোলজির এই একটা বড় ড্র্যাব্যাক ঃ মানুষকে সবসময় প্রোটেক্ট করে। বিউটিফুল থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স। আই রিয়েলি লাভ দেম।' কথা বলতে-বলতে জনার্দনকে ইশারা করলেন। জনার্দন সাহা রিভলভারটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

'যাই হোক—শোনো, মা আর ছেলে...' ডানহাতটা তখনও টেপাটিপি করছিলেন রীতেশ জেঠু: 'যেভাবেই অঙ্কটা করো না কেন উত্তর সেই একই ঃ সফটওয়্যার প্যাকেজ আর পেটেন্ট। সাড়ে তেইশ লাখ টাকা নেহাত কম নয়! আমার প্রোপোজাল যদি অ্যাকসেপ্ট করো তা হলে গুড। তা না হলে ব্যাড। বাড়ি-গাড়ি সব যাবে—তার সঙ্গে প্রাণটাও বোনাস হিসেবে চলে যেতে পারে...' গলা খুলে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন ঃ 'সাতটা দিন ভেবে নাও। তারপর আমি ফোন করব। ফোন করে তারপর আসব। তখন কিন্তু কোনও "না" শুনব না—।'

অসহায়ের মতো একটা অর্থহীন চিৎকার করে উঠলাম। তারপর জুপিটারকে বললাম, 'জুপিটার, এক্ষুনি এই ছোটলোক দুটোকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও!'

রীতেশ আবার হেসে উঠলেন।

জুপিটার তখন ওঁর দিকে এগোচ্ছে।

'শোনো হে আগামী দিনের সফ্টওয়্যার-দেবতা সুকিরণ। জুপিটার আমাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করতে পারবে না। ও আমার গায়ে টাচ করামাত্রই আমি ব্যথা লাগছে বলে চেঁচাব। আর তখনই থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স-এর খেলা শুরু হবে। আমার "ক্ষতি" হচ্ছে মনে করে জুপিটার আমার গা থেকে হাত সরিয়ে নেবে। ফিনিশ্ড।'

এবং সত্যিই তাই হল।

রীতেশ বসাক সোফায় বসেছিলেন। জুপিটার ওঁর কাছে গিয়ে যেই না ওঁর হাত ধরে টান মেরেছে অমনি রীতেশ যন্ত্রণায় চেঁচাতে শুরু করলেন।

ওঁর অভিনয়ে কাজ হল। জুপিটার হাত সরিয়ে নিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি, জুনিয়ার। আবার ওই ল'গুলোর রেস্ট্রিক্‌শান ফেস করছি। সেকেন্ড ল' অ্যান্ড ফার্স্ট ল'। আমাকে ক্ষমা করো।'

রীতেশ এবং জনার্দন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দুজনেই হাসছে।

টেবিলের সিগারেটটা পুড়ে-পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। এয়ারকন্ডিশান্ড ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া। আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। মা কয়েকবার কেশে উঠল।

রীতেশ বললেন, 'সুকিরণ, তোমরা আশা করি মোবাইল ফোন বদলানোর চেষ্টা করবে না—কিংবা বাড়ি ছেড়ে পালাবে না। শুধু একটা কথা বলি ঃ আমার নেটওয়ার্ক অনেক বড়। তাই আমার হাতও অনেক লম্বা। তা ছাড়া কিরণ রায়ের নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। আমার চোখকে তোমরা ফাঁকি দিতে পারবে না।'

হাততালি দিয়ে হাত ঝাড়লেন রীতেশ বসাক। আমাদের দিকে তাকিয়ে একচিলতে তেরছা হাসলেন ঃ 'সাতটা দিন সময় দিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চটকাচটকি হয়েছে। তাই এবার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। মনে থাকে যেন! সাতটা দিন...।'

জনার্দন আর রীতেশ চলে গেলেন।

অপমান আর উত্তেজনায় আমি কাঁপছিলাম। বারবার ভাবছিলাম, জুপিটার কী লেভেলের অপদার্থ রোবট। আমাদের আসল বিপদে ও কোনও কাজেই এল না! সিকিওরিটি রোবটের সিকিওরিটির এই নমুনা!

বেশ বুঝতে পারছিলাম, রীতেশ বসাক ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছেন। ওঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও পথ আছে বলে মনে হল না। শেষকালে কি আমাকে আর মা-কেও বাবার পথ ধরতে হবে? এ-পৃথিবীতে বিচার বলে কিছু নেই!

ওরা চলে যাওয়ার পর মা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। টের পেলাম মা থরথর করে কাঁপছে।

সেই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে মা বলল, 'এখন আমাদের কী হবে রে, সুকি?'

●

আজও মা সেদিনের মতো কাঁপছিল আর কাঁদছিল।

'আমাদের এখন কী হবে রে, সুকি? ওরা আজ রাতে আবার আসবে বলেছে—।'

মা-কে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম বটে, কিন্তু নিজের কানেই সেটা কেমন ফাঁপা শোনাচ্ছিল।

রীতেশ জেঠু আমাদের সাতদিন সময় দিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু গত সাতদিনে অন্তত সত্তরবার ফোন করে হুমকি দিয়েছেন। সাতদিনের এক-একটা দিন যত কমে এসেছে শাসানির চেহারা প্রচ্ছন্ন থেকে ক্রমশ নগ্ন হয়েছে।

মা-কে সামলে নেওয়ার সময় দিলাম। ধরে-ধরে সামনের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

'কে ফোন করেছে, মা?'

'রীতেশ বসাক। আর শেষদিকে জনার্দন সাহা কথা বলেছে.....।'

আমি মায়ের একটা হাত মুঠো করে ধরলাম।

'ভয় পেয়ো না, মা। ওরা কী বলেছে বলো—।'

মা কাঁপা গলায় বলল, 'ওরা আজ রাতে আসবে। এই লাস্ট। আর আসবে না। রীতেশ বসাক বলল, তোর বাবার যেসব জিনিস আমরা আগলে রাখার চেষ্টা করছি সেসব যদি ও আজ হাতে না পায় তা হলে সেগুলো তছনছ করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবে। ওগুলো কোনওদিন আর দিনের আলো দেখবে না—।'

'আর জনার্দন সাহা কী বলল?'

'বলল যে...' মা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ঃ 'বলল যে, পেট্রল দেশলাই কিছু জোগাড় করে রাখতে হবে না। সব ও সঙ্গে নিয়ে আসবে...সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে।'

মা কান্নায় ভেঙে পড়ল। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই আমাকে আবার জাপটে ধরল। তারপর কান্না জড়ানো গলায় বারবার বলতে লাগল, 'আমাদের এখন কী হবে রে! আমাদের এখন কী হবে...।'

মায়ের বুকের ভেতরে যে-যন্ত্রণা আর আতঙ্ক মুচড়ে-মুচড়ে পাক খাচ্ছে তার ভয়ংকর চেহারা আমি ভালোই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এখন ভয় পেয়ে বা কান্নাকাটি করে কোনও লাভ নেই। বরং মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে।

জুপিটার আমাদের মা আর ছেলের কাণ্ড দেখছিল। কিন্তু ভালো করে গোটা গল্পটা বুঝতে পারছিল না।

ও আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল। নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'আমি কি কোনওরকম সাহায্য করতে পারি?'

আমি বিরক্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। তিন সূত্রে বাঁধা এই গোবেচারা রোবট কী-ই বা সাহায্য করবে! আমাদের চারদিক যখন অন্ধকার তখন এই যন্ত্রদাস আর কোন আলোর ঠিকানা দেখাতে পারে!

তাই, বিরক্তি আর রাগ চেপে আমি বললাম, 'না জুপিটার, তুমি কোনও সাহায্য করতে পারো না।'

একবার মনে হল বলি, 'তুমি বরং ছাদে যাও—সেখান থেকে পাঁচিল টপকে নীচে ঝাঁপ দাও—।'

কিন্তু না, তাতে কোনও কাজ হবে না। তৃতীয় সূত্র ওকে 'রক্ষা' করবে।

জুপিটারকে বললাম, 'তুমি বরং তোমার ঘরে যাও—গিয়ে বিশ্রাম নাও—।'

ডোমেস্টিক সারভিস অ্যান্ড সিকিওরিটি রোবট তার হ্যাঁচকা ঢঙে রওনা হয়ে গেল।

একটু পরে মা আরও শান্ত হলে মা-কে এক গ্লাস জল খাওয়ালাম। তারপর মায়ের কাছে স্থির হয়ে বসলাম।

'মা, এসো ঠান্ডা মাথায় একটু ভাবি। রীতেশ জেঠুদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কিছু একটা করা দরকার...।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুই ভাব, সুকি—আমি আর ভাবতে পারছি না...।'

মায়ের মুখের দিকে ভালো করে দেখলাম। এই দেড়মাসে মায়ের বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। সুন্দর মুখশ্রী এখন পলেস্তারা চটে যাওয়া পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের মতো। সিঁদুরহীন সিঁথি যেন ধু-ধু মাঠ। সে-মাঠে একটাও গাছপালা নেই।

মা বিধবা হওয়ার পর আমি জেদ করে মা-কে সাদা শাড়ি পরতে দিইনি। তাই পরনের সেই রঙিন পাড়ের শাড়িটাই যা একটু-আধটু জীবনের ছোঁয়া। নইলে বোধহয় মনে হত না, মা বেঁচে আছে।

আমি মনে-মনে পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করলাম।

রীতেশ বসাকের এই অসহ্য চাপের মুখে আমরা এখন কী করব?

সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে বাঁচার জন্যে যা-যা করে আমরা তার সবই করেছি।

প্রথমে ব্যাপারটা রিলেটিভদের জানিয়েছি।

আমার কোনও কাকা নেই, পিসিও নেই। তাই তাকিয়েছি মামাবাড়ির দিকে।

রীতেশ বসাকের চরিত্র আমি আর মা প্রথম-প্রথম বুঝতে পারিনি। তারপর, বেশ কিছুদিন পর, আমরা ওঁকে 'কেমন-কেমন' ভাবতে শুরু করেছি। তৃতীয় ধাপে বাবার টুকরো-টুকরো কথায়, আভাসে ইঙ্গিতে, ওঁকে আরও একটু 'চিনতে' পারি। আর শেষ বা চতুর্থ ধাপটা হল বাবা মারা যাওয়ার পর—অর্থাৎ, বাবার শেষ চিঠি।

মায়ের দুই দাদা—বড়দা আর ছোড়দা। আমার বড় মামা আর ছোট মামা।

ছোটমামা বেশ রোগা আর ছোটখাটো। নাকের নীচে সরু গোঁফ আছে। কিন্তু বড়মামা একেবারে উলটো। বড়সড় চেহারা, চোখে চশমা। একটু জোরে কথা বলেন। কথা বলার সময় থুতু ছিটকে বেরোয়। বড়মামা নাকি প্রবল চেষ্টা করেও এই দোষটা সারাতে পারেননি।

ওঁদের যখন সব কথা জানালাম তখন ওঁরা দুজনেই বললেন, 'আগে এসব বলিসনি কেন?'

'আগে এতসব বুঝতে পারিনি।' মা বলল।

'এখন বুঝলি কেমন করে?'

'মারা যাওয়ার আগে সুকির বাবা আমাকে অনেক কথা জানিয়েছে—' মা কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলল, কারণ বাবা জানিয়েছে মুখে নয়, ওই তিন পাতার চিঠিতে। তারপর ঃ '...তারপর...ও চলে যাওয়ার পর...আরও অনেক কিছু জানতে পারি—।'

আমি বললাম, 'জানো, লোকটা রেগুলার ফোন করে থ্রেট করে। একদিন তো একটা রিভলভার বের করে আমাদের ভয় দেখাল...।'

কপালে অনেক ভাঁজ ফেলে ছোটমামা আর বড়মামা সব শুনলেন।

তারপর বড়মামা বেশ চিন্তার গলায় বললেন, 'কোম্পানির পার্টনারশিপের গন্ডগোল...এ তো কেসকামারির দিকে এগোবে। রীতেশ বসাক তো মনে হয় কেস করবে। অতগুলো টাকার ব্যাপার...।'

'লোকটা এক নম্বরের জোচ্চোর, বদমাশ। নিশ্চয়ই ও বাবার সই জাল করে লোনের কাগজপত্র তৈরি করেছে। নয়তো বাবাকে ভুল বুঝিয়ে একগাদা কাগজের সঙ্গে মিশিয়ে লোনের ইন্টারেস্ট কারচুপি করা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছে....।'

বড়মামা আর ছোটমামা আমার কথা শুনলেন বটে কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হল না। তা ছাড়া ওঁদের চোখেমুখে যে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠেছিল সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি।

ছোটমামা হঠাৎ মা-কে বললেন, 'লোকটা কীসব সফ্‌টওয়্যার প্যাকেজ, পেটেন্ট রাইট আর মাইক্রোসিডি চাইছে—সেগুলো সব ওকে দিয়ে দে না!'

মা হতবাক হয়ে ছোটমামার দিকে তাকাল ঃ 'কী বলছ, ছোড়দা! যে-জিনিসগুলো ও বেঁচে থাকতে দিতে চায়নি সেগুলো আমি হাতে ধরে দিয়ে দেব? ওগুলোর জন্যে আমরা কোনও টাকা চাই না। শুধু চাই, আমাদের দেশের সমস্ত ছোট-বড় সফ্‌টওয়্যার কোম্পানি যখন ওগুলো ব্যবহার করবে তখন যেন কিরণ রায়ের নাম হয়। ব্যস, আর কিছু আমরা চাই না। কী বল, সুকি?

মা আমার কাছে সায় চাইল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বারবার মাথা ঝাঁকালাম। বললাম, 'ছোটমামা, আমরা শুধু এটুকুই চাই—তার বেশি কিছু না।'

ওঁরা দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বড়মামা বললেন, 'তোরা কিছুদিন আমাদের বাড়িতে এসে থাক। পরে বিপদ কেটে গেলে দেখা যাবে—।'

ছোটমামা ওঁর দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাদা, সেই পিরিয়ডে যদি রীতেশ বসাক কেস করে দেয় তা হলে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে।' এবার ছোটমামা মায়ের দিকে ফিরলেন ঃ 'বোন, ব্যাপারটা একবার বোঝ। তোরা এখানে চলে এলে রীতেশের উকিল বলবে, লোনের লায়েবিলিটি এড়ানোর জন্যে তোরা বাড়ি ছেড়ে অ্যাব্‌স্কন্ড করেছিস। তখন তো রীতেশ বসাক তোদের নামে বডি ওয়ারেন্ট

বের করে ছাড়বে!'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ছোটমামা, অ্যাব্স্কন্ড মানে কী?'

মামা আমার দিকে চোখ ফেরালেন : 'এটাও জানিস না? অ্যাব্স্কন্ড মানে গা ঢাকা দেওয়া। আর বডি ওয়ারেন্ট মানে হল...।'

মামাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'না, ওটার মানে আমি জানি।'

ছোটমামার কথাগুলো আমাকে খুব ধাক্কা দিল। অ্যাব্স্কন্ড! বডি ওয়ারেন্ট!

এ-পৃথিবীটা বোধহয় আর বাসযোগ্য নেই।

বড়মামা বললেন, 'তোরা বরং পুলিশের কাছে যা। একমাত্র পুলিশই ব্যাপারটা ঠিকভাবে হ্যান্ডল করতে পারবে।'

আলোচনাটা শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছচ্ছে সেটা আমি ভালোই বুঝতে পারছিলাম। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, মা-ও সেটা বুঝতে পেরেছে।

ছোটমামা বললেন, 'সুকি, রাতে তোরা এখানে খাওয়াদাওয়া করে যা...।'

মা আমার হয়ে নিষ্প্রাণ গলায় জবাব দিল, 'না গো, ছোড়দা— বাড়িতে রান্না নষ্ট হবে...।'

ছোটমামা জানে এটা মিছে কথা। ছোটমামা যে জানে সেটা মা-ও জানে। আর মা যে জেনেশুনে এ-কথা বলছে সেটা বড়মামাও জানে।

কারণ, এখন কারও বাড়ির খাবার নষ্ট হয় না। সবাই খাবার ওজোন চেম্বারে রাখে। সরকারি রিফিলিং স্টেশান থেকে ওজোন গ্যাস বিনাপয়সায় পাওয়া যায়। এ ছাড়া খাবার নষ্ট করা সরকারি আইনে বারণ। ধরা পড়লে ফাইন দিতে হয়।

অনেকটা সময় নষ্ট করার পর আমরা সেদিন মামাবাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম।

এর ঠিক দু-দিন পর আমরা লালবাজারের সেন্ট্রাল ক্রাইম কন্ট্রোল-এ গেলাম।

দুজন পুলিশ অফিসার—একজন রোগা, একজন বেশ মোটা— আমাকে আর মা-কে নিয়ে একটা কাচের ঘরে ঢুকলেন। একদিকের দেওয়ালে অনেকগুলো কম্পিউটার স্ক্রিন। তাতে অফিসের নানান অংশের ছবি। তারই দুটোতে ক্রাইম নিউজ চ্যানেলের রেড হট নিউজ চলছে।

ওঁরা দুজন খুব শান্ত গলায় আমাদের দীর্ঘস্থায়ী জেরা শুরু করলেন। বারবারই যথেষ্ট বাঁকা পথে ওঁরা মূল প্রসঙ্গে আসছিলেন।

জেরায়-জেরায় যখন আমাদের পাগল হওয়ার মতো অবস্থা তখন আমার হঠাৎই মনে হল, অফিসার দুজনের মুখের চেহারা ধীরে-ধীরে ছোটমামা আর বড়মামার মুখের আদলে বদলে যাচ্ছে।

চারঘণ্টা পর আমরা ছাড়া পেলাম।

ওঁরা পরদিন যে-পরিমাণ নথিপত্র নিয়ে আমাদের সেন্ট্রাল ক্রাইম কন্ট্রোল-এ আসতে বললেন, তাতে মনে হল প্রযুক্তি হাজার গুণ এগিয়ে গেলেও শামুকের সঙ্গে পুলিশি তদন্তের মিলের মহান ঐতিহ্যের বিশেষ কোনও ডেভেলাপমেন্ট হয়নি।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ক্রাইম কন্ট্রোল থেকে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আমার মনটা কেমন খাঁ-খাঁ করছিল। মনে হচ্ছিল, আমি মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার চারদিকে অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার।

তারপর আরও দুটো দিন আমি আর মা ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছি। মায়ের মোবাইল ফোন বেজে উঠলেই আঁতকে উঠেছি। এবং ধীরে-ধীরে এটা বুঝেছি, আমি আর মা—আমরা দুজনে একা। আমাদের আর কেউ নেই।

এ-কথাটা এই মুহূর্তে আরও একবার মনে হল।

বিপদে পড়লে মানুষ দিশেহারা পাগলা কুকুরের মতো ছুটোছুটি করে। ভাবে বোধহয়, বাঁচার জন্যে সে একটা-না-একটা পথ খুঁজে পাবে।

কিন্তু যখন কোনও মানুষ দ্যাখে তার সামনে কোনও পথ নেই, চারদিকে শুধুই অন্ধকার, তখন সে বোধহয় শান্ত হয়ে যায়। ছুটোছুটি থামিয়ে সে তখন এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে শেষ মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করে।

আমারও তাই হল।

কোমল আদরে মায়ের একটা হাত মুঠো করে ধরলাম আমি। বাচ্চা ছেলের মতো আদুরে গলায় বললাম, 'মা, চলো, আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাই—।'

মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

মায়ের মুখে আমি বিচিত্র এক আলো দেখতে পেলাম।

'যাবি, সুকি, যাবি?' কিশোরীর আগ্রহে মা বলে উঠল : 'সত্যি বলছি, ওখানকার দিনগুলো কী সুন্দর ছিল...কী আনন্দের ছিল...।'

সেদিন দুপুরেই আমি আর মা পাটুলির বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

আমার কয়েকটা পড়ার বই আমি সঙ্গে নিলাম। আর বাবার সব মাইক্রোসিডি আর বাঁধানো খাতাগুলো একটা লাইটওয়েট সুটকেসে ঢুকিয়ে নিলাম।

মা দরকারি জিনিসপত্রে ব্যাগ গুছিয়ে নিল। বাবার ফটোটা একটা সুটকেসে জামাকাপড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। আর একটা খামে ভরে নিল বাবার লেখা শেষ চিঠিটা।

ওটা মা সবসময় কাছে-কাছে রাখে।

●

চার বছর আগে পাটুলির বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বাবা বলেছিল, আমাদের বাড়িটা পোড়োবাড়ির মতো হয়ে গেছে।

বাবা বাড়িটা নিজের চোখে দেখে এসে ও-কথা বলেছিল, কিন্তু আমরা কলকাতায় বসেই বাড়িটা কম্পিউটারের পরদায় দেখতে পেতাম। তার জন্যে 'গুগ্ল আর্থ স্কোয়ার' সফ্টওয়্যারের এনভায়রনমেন্টে ঢুকতে হত। তাতেই দেখতাম, বাবার এককালের সাধের বাড়িটা কীভাবে ধীরে-ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে।

আজ, কী আশ্চর্য, আমাদের চরম বিপদে যখন কোনওদিকে আলো নেই তখন আলোর খোঁজে আমি আর মা সেই ক্ষয়াটে ভালোবাসার আশ্রয়ের দিকে ছুটে চলেছি।

কলকাতার সবকিছু পেছনে ফেলে আমরা অতীতের দিকে পা বাড়ালাম। রইল পড়ে বাড়ি-গাড়ি, শহুরে প্রযুক্তি, হেলি-ট্যাক্সি, চলমান পথ, মালটিলেয়ার ফ্লাইওভার, আর শহুরে যত আরাম।

বাবার স্যাটেলাইট মোবাইল ফোনটা মা সঙ্গে নিয়েছে—কোনও জরুরি দরকারে কাউকে ফোন করার জন্যে। এ ছাড়া ফোনটা মা সবসময় সুইচ অফ করে রাখবে।

স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আমরা লটবহর নিয়ে দুটো সাইকেল রিকশায় চড়ে বসলাম। একটায় আমি আর মা, অন্যটায় আমাদের মালপত্র।

এক অদ্ভুত আবেগ আমার মনের ভেতরে কাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, যে-ভিটের দিকে আমরা ছুটে চলেছি সেটা যেন সামনে দু-হাত বাড়িয়ে আমাদের ডাকছে। বলছে, 'সুকি, এতদিন বাদে আমার কথা তোদের মনে পড়ল!' ছোটবেলার যেসব স্মৃতি ধূসর হয়ে সাদা-কালো হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ক্রমে আবার স্পষ্ট আর রঙিন হয়ে উঠতে লাগল।

লক্ষ করলাম, মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ছোট খুকির চঞ্চল চোখে মা চারপাশটা দেখছে। আর আমাকে নানান কথা বলছে, চারপাশের নানান জিনিসের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছে।

'বাব্বাঃ, কত নতুন-নতুন বাড়ি হয়ে গেছে! ওই দ্যাখ—ওটা প্রাইমারি স্কুল—পাটুলি বিদ্যাপীঠ। ওটার চারপাশের বাউন্ডারি ওয়ালটা নতুন। আর বাঁ-দিকটায় দুটো বড়-বড় আমগাছ ছিল—ওগুলো কেটে ফেলেছে দেখছি।...আর, ওই দ্যাখ—ওই যে একটা বড় পুকুর দেখছিস—তোর বাবারা ওটাকে বলত জোড়া পুকুর। পাশেই আর-একটা ছিল, তাই। ওই যে, দোতলা বাড়িটা—সেকেন্ড পুকুরটা

বুজিয়ে ওটা উঠেছে...।'

এবড়োখেবড়ো রাস্তা, সাইকেল রিকশার প্যাঁকপ্যাঁক হর্ন, অসংখ্য গাছপালা, উজ্জ্বল নীল আকাশ, সবুজ ধানখেত, চাষজমিতে জোড়া বলদ, টিনের চাল আর টালির চালে ছাওয়া বাড়ি—আমি মনে-মনে হারিয়ে যাচ্ছিলাম।

প্রযুক্তি যে-দুরন্ত গতিতে শহরের সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছে, বিদেশের নামি শহরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জায়গায় নিয়ে গেছে, তার সঙ্গে গ্রামবাংলার উন্নয়নের তাল আর ছন্দ একেবারেই মেলে না। আমাদের এই গ্রাম বিদেশের কোনও গ্রামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতেও লজ্জা পাবে। কিন্তু আমার গ্রামটা গ্রামের জায়গাতেই আছে দেখে আমার ভালো লাগছিল। এরকম একটা গ্রামে আমি বেশ কয়েকটা জীবন কাটাতে চাই।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, রীতেশ বসাক, জনার্দন সাহা, উমেশ সকসেনা—ওদের কথা অনেকক্ষণ আমার মনে পড়েনি।

একটু পরেই আমাদের বাড়ির সদরে রিকশা এসে থামল। 'গুগ্‌ল আর্থ স্কোয়ার'-এর ডিজিটাল ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম, ছবি আর চোখের সামনে দেখার মধ্যে কত তফাত! বাড়িটার যেমন, বাবার ফটোর বেলাতেও তাই।

অনেকটা জমির ওপরে আমাদের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার সামনে এখন কোমর সমান উঁচু জং ধরা গ্রিলের গেট। গেটে তালা লাগানো।

মা ব্যাগ থেকে চাবির গোছা বের করল। তার থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে তালা খুলল।

গেটের পাল্লা ঠেলতেই জং ধরা লোহা অনিচ্ছার আর্তনাদ করে উঠল। মরচের গুঁড়ো লেগে গেল আমার হাতে।

বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার যে-রাস্তাটা একসময় স্পষ্ট ছিল সেটা এখন আগাছা আর বড়-বড় ঘাসের আড়ালে দেখা যায় কি যায় না।

সেই রাস্তার শেষে দাঁড়িয়ে থাকা পলেস্তারা খসা জীর্ণ বাড়িটা দোতলা। দোতলায় সদর দরজামুখী একটা চওড়া ঝুলবারান্দা। বারান্দার এপাশ-ওপাশ থেকে বট আর অশ্বত্থের চারা গজিয়ে দিব্যি মাথা তুলেছে।

বাড়িটার জানলাগুলো সব বন্ধ। জানলার পাল্লার রং উঠে গিয়ে রোদ-বর্ষায় ভাজা-ভাজা হয়ে কাঠের শিরা বেরিয়ে গেছে।

জরাজীর্ণ বাড়িটাকে আগাছা যেভাবে ঘন হয়ে ঘিরে ধরেছে তাতে মনে হল বায়না করা তিন-চারটে বাচ্চা তাদের মা-কে আঁকড়ে ধরে গায়ে লেপটে আছে।

মা এগিয়ে গিয়ে বাড়ির দরজার তালা খুলল। আমি রিকশা ছেড়ে দিয়ে দু-দফায় মালপত্র টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেলাম।

বিকেলের রোদ তেরছাভাবে বাড়ির দরজায় এসে পড়েছিল। মায়ের মুখের একপাশটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। মা দরজা ঠেলতেই একরাশ ধুলো পাল্লার গা থেকে ঝরে পড়ল।

আমি মায়ের কাছ থেকে বাবার ফোনটা চেয়ে নিলাম। ওটা অন করে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটিকে বাড়ির ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যাক্টিভেট করার জন্যে এস. এম. এস. করলাম। সঙ্গে আমাদের এ-বাড়ির কনজুমার কোড জুড়ে দিলাম। এই কোডটা বরাবর বাবার মোবাইলের 'মেমো' সেকশানে স্টোর করা থাকে। সেখানে অন্যান্য আরও অনেক কোড স্টোর করা আছে।

এস. এম. এস. করার দশ সেকেন্ডের মধ্যে সাপ্লাই অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল। কারণ, বাড়িতে ঢুকেই আমরা দেখলাম 'রিমোট ট্রান্সমিশান ডিজিটাল স্মার্ট মিটার'-এর নীচে সাপ্লাই অ্যাক্টিভেশানের লাল এল. ই. ডি. বাতি জ্বলছে।

মা একতলার ড্রইংরুমের একটা টিউবলাইট অন করে সাপ্লাই অ্যাক্টিভেশানের ব্যাপারটা হাতেকলমে যাচাই করে নিল।

চারপাশে তাকিয়ে দেখি সর্বত্র ধুলোয় ধুলোময়।

বেশ বুঝলাম, বাড়িটাকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে অন্তত একটা বেলা আমাকে আর মা-কে পরিশ্রম করতে হবে। সে-কথাই আমরা দুজনে আলোচনা করছিলাম।

এমন সময় পায়ের শব্দ পেলাম। ভারী পা ফেলে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে।

আমি আর মা কথা থামিয়ে হাঁ করে সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইলাম।

দোতলা থেকে কে নেমে আসছে! রীতেশ বসাক কিংবা ওঁর লোকজন কি এর মধ্যেই এ-বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেছে? তাদেরই কেউ কি আমাদের আগেই এখানে পৌঁছে গেছে? পাচিল টপকে দেওয়াল বেয়ে দোতলার বারান্দা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে? এখন আমাদের শব্দ-টব্দ পেয়ে নেমে আসছে দোতলা থেকে?

আমাদের ভুলে যাওয়া ভয়টা হঠাৎ ফিরে এল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নেমে এল তাকে দেখে আমার চোখে জল এসে গেল। ছোটবেলাটা পলকে আবার ফিরে এল।

গজমেন্দ্র! আমার গজমেন্দ্র!

আমাদের দেখে ও ভাঙা-ভাঙা কর্কশ ধাতব গলায় ডেকে উঠল, 'বাবু! মা! এতদিন পরে তোমাদের আসার সময় হল!'

কিন্তু মগজেন্দ্রর এ কী চেহারা হয়েছে!

সারা গায়ে রাজ্যের ধুলো আর ময়লা। ইস্পাতের ওপরে ইনস্ট্যান্ট স্টিকিং গাম দিয়ে লাগানো পলিমারের চাদর জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। শীতলপাটি ব্যবহারে-ব্যবহারে বহু পুরোনো হয়ে গেলে তার যেমন দশা হয় ঠিক সেইরকম।

মনে আছে, ছোটবেলায় মগজেন্দ্রর শরীরের ইস্পাতের মোড়ক কিংবা কলকবজা সবই কেমন ঝকঝক করত। এখন সেসব মরচে ধরে কালো হয়ে গেছে। মগজেন্দ্রর চলাফেরার সময় ক্যাঁচক্যাঁচ করে আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি মগজেন্দ্র হুড়মুড় করে ধসে পড়বে, আর ওর লোহা আর তামার টুকরোটাকরাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রখান হয়ে যাবে।

আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর ছানাবড়া সরল চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'গজমেন্দ্র, তুমি কেমন আছ?'

ভারী মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল ও। তারপর আমার খুব কাছে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যাতে আমার একটুও ব্যথা না লাগে। তারপর ভাঙা মেটালিক ভয়েসে বলতে লাগল, 'একদম ভালো নেই, বাবু—একদম ভালো নেই। বন্ধ বাড়িতে একা-একা থাকতে কারও ভালো লাগে! রোজ ভাবি, এই বোধহয় তোমরা আসবে—কিন্তু এলে কই? সেই দশটা বছর ধরে আমি ওয়েট করে আছি। চারবছর আগে...।'

আমাকে ছেড়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল সেকেলে রোবটটা। তারপর আবার কথা বলতে লাগল, 'চারবছর আগে বড়বাবু একবারটি এল—ব্যস। তার পর থেকে সেই যে উধাও হল আর এ-মুখো হল না। তা বড়বাবু কোথায়? তোমাদের সঙ্গে আসেনি?'

আমাকে আর মা-কে ডিঙিয়ে দরজার দিকে উঁকি মারল মগজেন্দ্র। ওর চোখ—মানে, অপটিক্যাল লেন্স সিস্টেম—বাবাকে খুঁজল। কিন্তু পেল না।

ও এবার মায়ের দিকে তাকাল : 'মা, বড়বাবু কোথায়? কলকাতায়?'

মা মাথা নীচু করে আলতো গলায় জবাব দিল, 'বড়বাবু আর নেই রে। কলকাতাতেও নেই, আর এ-বাড়িতেও আর কখনও আসবে না—।'

মগজেন্দ্রর ভেতরে এক্সপার্ট সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার থাকা সত্ত্বেও ও মায়ের কথার আসল অর্থ ধরতে পারল না। ওর পরের প্রশ্ন শুনেই ব্যাপারটা বোঝা গেল।

'কী হয়েছে বড়বাবুর? কোথায় গেছে?'

আমি তখন স্পষ্টভাবে বললাম, 'বড়বাবু মারা গেছে, মগজেন্দ্র। তাই আর কখনও এ-বাড়িতে আসবে না—।'

রোবটটা কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোল-গোল শূন্য চোখে একবার মা-কে আর একবার আমাকে দেখতে লাগল।

রোবট কাঁদতে পারে না। এটা হয়তো ওর বিকল্প অভিব্যক্তি।

প্রায় একমিনিট নীরবতা পালন করল মগজেন্দ্র। তারপর দার্শনিকের মতো বলল, 'স্রষ্টা চলে গেল, সৃষ্টি রয়ে গেল। এটাই হয় সবসময়।'

ও যেন ঘোর কাটিয়ে মালপত্রগুলোর কাছে গেল। ভারী-ভারী সুটকেস আর বাক্সগুলো অনায়াসে হাতে আর কাঁধে তুলে নিল। আমাদের ডাকল ঃ 'এসো, মা। বাবু, এসো—।'

তারপর ও কথা বলতে-বলতে হাঁটা দিল দোতলার সিঁড়ির দিকে। আমরাও ওকে ফলো করলাম।

'আমি তো বাড়িটাকে সবসময় ঝকঝকে তকতকে রাখতে চাই, কিন্তু পারব কেমন করে? ঝাঁটা নেই। দোতলায় একটা বোতলে ক্লিনিং কেমিক্যাল ছিল ভাগ্যিস। সেটা কিপ্‌টের মতো খরচ করে-করে দোতলার ড্রইং-ডাইনিং আর বেডরুমগুলো কোনওরকমে সাফসুতরো রেখেছি।

'প্রথমদিকে টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার এগুলো মাঝে-মাঝে চালাতাম—যাতে যন্ত্রগুলো বিগড়ে না যায়। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই ইলেকট্রিক লাইন ভোঁ-কাট্টা। তারপর থেকে তো বছরের পর বছর ওগুলো পড়ে আছে।

'আমারও তো এত বছরে অকেজো হয়ে যাওয়ার কথা। নেহাত বড়বাবু স্যাটেলাইট চার্জিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তাই বাঁচোয়া। তো দশবছর ধরে নিজেকে একঘেয়েভাবে রিচার্জ করে চলেছি আর বন্ধ বাড়ির ভেতরে ভূত-পেতনির মতো একতলা-দোতলা করে বেড়াচ্ছি। আশপাশে মানুষজন একেবারে না থাকলে ভালো লাগে? যাক, এবার তোমরা এলে। তোমরা ক'দিন থাকলেই বাড়িটা আবার পুরোনো মেজাজে ফিরে আসবে—।'

মগজেন্দ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই মা বলল, 'আমরা আর কলকাতায় ফিরব না বোধহয়...।'

দোতলার একটা শোওয়ার ঘরে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। মায়ের কথা শুনে মগজেন্দ্রর হাত থেকে দুটো সুটকেস মেঝেতে খসে পড়ল।

'সে কী, মা! সত্যি?'

মা হেসে বলল, 'হ্যাঁ—সত্যি।'

মগজেন্দ্র নাচিয়ে বাউলদের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওপরে হাত তুলে তিনবার পাক খেয়ে নিল। লোহায়-লোহায় ঠোকাঠুকি হয়ে ঘুঙুরের শব্দের মতো শোনাল।

আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। মা-কে দেখে বুঝতে পারছিলাম, মায়েরও।

এই আনন্দের অনেকটাই মগজেন্দ্রকে ঘিরে, কারণ, ও পুরোপুরি বাবার হাতে তৈরি। বাবার ছোঁয়া ওর আপাদমস্তক।

তাই এ-বাড়িটায় যত অসুবিধেই থাক, আমরা তিনজনে মিলে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই সংসার পেতে বসলাম।

সন্ধের পর আমি একাই বাইরে বেরোলাম। মুদিখানা থেকে কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। তার সঙ্গে আনাজপাতিও বাজার করতে হবে। নইলে আমরা খাব কী?

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, এই দশ বছরে পাটুলি খুব একটা পালটায়নি। ওর পুরোনো চেহারাটাই খানিকটা ঘষেমেজে কেউ সাজিয়ে দিয়েছে।

আকাশপথে হেলি-ট্যাক্সি উড়ে যাচ্ছিল—একটাও নামছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, সভ্যতা বা প্রযুক্তির বেশিরভাগটাই বোধহয় আকাশপথে ছুটে যায়, মাটির কথা ওদের মনে থাকে না।

বরং আকাশের চাঁদ-তারা ভীষণ পুরোনো হলেও সবসময় নতুন লাগে।

বাজার-টাজার সেরে বাড়ি ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, আমি যেন টাইম মেশিনে চড়ে সময়ের পথ ধরে অনেকটা পিছিয়ে এসেছি। এবং এসে আমার বেশ ভালো লাগছে।

সে-রাতে মা যখন রান্না করছিল, আমার মনে হল, এত সুন্দর রান্নার গন্ধ আমি জীবনে কখনও পাইনি।

●

এর পরের তিনটে দিন নিশ্চিন্তে কেটে গেল।

মা-কে দেখলাম, বেশ সহজে মানিয়ে নিয়েছে। মা রোজ রান্না করে, টিভি দ্যাখে, আমার সঙ্গে গল্প করে। আর রোজ সকালে বাবার ফটোয় ফুল দেয়, প্রণাম করে। তার সঙ্গে আমিও।

আমি সকাল-সন্ধে নিয়মিত পড়াশোনা নিয়ে বসতে লাগলাম। এ-বাড়ির কম্পিউটারটা অন করে দেখলাম চলছে। মেশিনটা অনেক পুরোনো মডেলের হলেও তাই দিয়েই কাজ চালাতে লাগলাম। শুধু বন্ধুদের ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে মনটা মাঝে-মাঝে খারাপ লাগে। তবে আমার গজমেন্দ্র সেটা অনেকটাই ভুলিয়ে দেয়।

বাড়ির মধ্যে আমি যখন হাঁটা-চলা করি তখন ও তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে। আমাকে সামলে নিয়ে যেতে চায়। ভাবে আমি সেই ছোটটিই আছি।

আমি হেসে ওকে বলি, 'গজমেন্দ্র, তুমি ভুলে যাও কেন, রোবটের বয়েস বাড়ে না—কিন্তু মানুষের বাড়ে। আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি। চলো, আমি বরং তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাই...।'

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে মা হাসে। মা-কে হাসতে দেখলে আমারও ভালো লাগে।

এর মধ্যে একদিন রাতে খেতে বসে আমি আর মা বাবার পেটেন্টের কাগজপত্র, বাঁধানো খাতা আর মাইক্রোসিডিগুলোর কথা, আর ওগুলো লুকিয়ে রাখার কথা, আলোচনা করছিলাম। মগজেন্দ্র তখন আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আর আমাদের দরকার মতো এটা-সেটা ফরমাশ খাটছিল।

আমাদের কথা শুনে ও হঠাৎ বলল, 'বাবু, একটা বুদ্ধি দেব?'

মা হেসে বলল, 'তোর আবার বুদ্ধি!'

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ছাড়ো না, মা। দেখি না ও কী বুদ্ধি দেয়—।'

তারপর মগজেন্দ্রকে বললাম, 'দাও, তোমার বুদ্ধি দাও—।'

ও বলল, 'বাবু, তুমি কাগজপত্র, খাতা—সব আমাকে পড়তে দাও। আমি পড়লেই ওগুলো সব হুবহু আমার মেমোরিতে গেঁথে যাবে। তারপর সিডিগুলো সব কম্পিউটারে ভরে কেবল দিয়ে সব ডেটা আমার মেমোরিতে চালান করে দাও। ব্যস, নিশ্চিন্ত।'

'কিন্তু ওগুলো সব তো থেকে যাবে। যদি কেউ সেগুলো হাতিয়ে নেয়?' আমি জিগ্যেস করলাম। কারণ, মগজেন্দ্রকে আমরা রীতেশ বসাক বা তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা কিছুই জানাইনি।

মগজেন্দ্র ঝটপট জবাব দিল, 'হাতিয়ে নেবে কেমন করে! তুমি ওগুলো পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেবে। ভাঁড়ার ঘরে দু-ক্যান পেট্রল আছে—আমি দেখেছি।'

আমি মায়ের মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে বুঝলাম, বোকাচন্দ্র রোবটটার বুদ্ধি মায়ের পছন্দ হয়েছে। সেইসঙ্গে আমারও।

মা-কে বললাম, 'তুমি শুতে যাও। আমি দেখছি কী করা যায়—।'

মা 'ঠিক আছে—' বলে চলে গেল।

আমার মনটা কু-ডাক ডাকছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, রীতেশ বসাক বসে থাকার লোক নন। নিশ্চয়ই তিনি হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজছেন। তাই সেদিন রাতেই আমরা কাজ শুরু করলাম। আমি আর মগজেন্দ্র একমনে সব 'কপি' করে চললাম। বাবার আবিষ্কারের সব তথ্য ওর রোবট-মগজে ঢুকতে লাগল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত প্রথম দফা কাজ করার পর আমরা থামলাম।

তারপর যখন ক্লান্ত হয়ে শুতে যাব, ঠিক তখনই মা হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এল। হাতে মোবাইল ফোন।

মায়ের মুখে একটু-আগে-দেখা হাসি আর খুশি এখন অজ্ঞাতবাসে চলে গেছে। তার বদলে একটা ফ্যাকাসে পরদা সেখানে জায়গা করে নিয়েছে।

'কী হয়েছে, মা?'

'এটা পড়ে দ্যাখ—।' মোবাইল ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দিল মা ঃ 'ছোড়দার সঙ্গে একটু কথা বলব বলে ফোনটা সবে অন করেছি—সঙ্গে-সঙ্গে এই এস. এম. এস.-টা এল—'

ফোনটা হাতে নিয়ে এস. এম. এস.-টা পড়ে দেখলাম ঃ

No use playing hide-n-seek
with me. I will pursue u. I
will find u. Finally I will kill
u. —Ritesh

এস. এম. এস.-টা রীতেশ পাঠিয়েছেন গতকাল। এর মধ্যে ফোন খোলা হয়নি বলে ওটা আমরা আগে পাইনি।

আমি তাড়াতাড়ি ফোনটা সুইচ অফ করে দিলাম। কিন্তু মনে-মনে ভয় থেকে গেল। কারণ, এখানে আসার পর আমি আর মা মাঝে-মাঝে ফোন অন করেছি—যেমন এখন। রীতেশ বসাক হয়তো পুলিশের হেল্‌প নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের খবর পেয়ে গেছেন। ক্রিমিনালদের ট্র্যাক করার জন্যে পুলিশ এখন নানারকমের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশান, গ্লোবাল পজিশানিং সিস্টেম আর গ্লোবাল ইনফরমেশান সিস্টেমের হেল্‌প নেয়। তাতে ক্রিমিনালদের খুব অ্যাকিউরেটলি লোকেট করা সম্ভব হয়। রীতেশ হয়তো পুলিশের কাছে গিয়ে আমাদের নামে ডায়েরি করেছেন। তারপর পুলিশের হেল্‌প নিয়ে আমাদের লোকেট করে ফেলেছেন।

আমি ভয় পেলেও মা-কে এসব কিছুই বললাম না। শুধু ফোনটা ফেরত দিয়ে বললাম, 'চিন্তা কোরো না, মা। তুমি যাও—গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি হাতের কাজটা সেরেই শুয়ে পড়ছি—।'

ভেবেছিলাম বাকি কাজটা কাল সকালে শেষ করব, কিন্তু এস. এম. এস.-টা দেখার পর মত পালটালাম।

মগজেন্দ্রকে বললাম, 'এসো গজমেন্দ্র, আজ রাতেই কাজটা শেষ করে ফেলি। তোমার আবার টায়ার্ড লাগছে না তো?'

কথাটা বলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। কারণ, মগজেন্দ্র রোবট—মানুষ নয়।

সে-কথাই ও জানিয়ে দিল আমাকে ঃ 'বাবু, আমি কখনও টায়ার্ড হই না। বড়বাবু এটা বুঝত। সেইজন্যেই প্রথমে ভেবেছিল আমার নাম রাখবে অক্লান্তকুসুম। কিন্তু নামটা ভীষণ খটমট বলে পরে চেঞ্জ করে মগজেন্দ্র করে দেয়। মগজেন্দ্র মানে হচ্ছে...।'

আমি 'থাক, থাক—বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' বলে ওকে থামালাম। তারপর মরিয়া জেদ নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ঘুমে চোখ টানছিল বলে উঠে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এলাম।

কাজ শেষ করতে-করতে আমাদের রাত দুটো বেজে গেল।

কিন্তু ভাগ্যিস কাজটা শেষ করেছিলাম।

কারণ, পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমি মায়ের কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে অন করতেই কেঁপে উঠলাম।

'এডুকেশান সার্ক্‌ল' নামে একটা ইন্টারনেট কোচিং সেন্টারে ফোন করব বলে ফোনটা অন করেছিলাম। কিন্তু অন করেই দেখি রীতেশ বসাকের মেসেজ।

বোতাম টিপতেই মেসেজের লেখা ফুটে উঠল ঃ

Would u mind if I
come inside right now? I want to
close the chapter today.
Kindly allow me to do
it without bloodshed.
—Ritesh

তার মানে? তার মানে কি রীতেশ বসাক এখন বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে?

ফোনটা হাতে করে ড্রইং-ডাইনিং থেকে ছুটে চলে এলাম বারান্দায়। কোথায়? কোথায় ওদের গাড়ি?

ওই তো, একটা টিউবওয়েলের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কালো রঙের মার্সিডিজ! গাড়ির ডানদিকের ফেন্ডারটা বেশ খানিকটা তোবড়ানো।

খেয়াল করিনি মা কখন যেন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কী হয়েছে, সুকি? বারান্দায় এলি কেন?' বলতে-বলতে মা আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

ঠিক তখনই মার্সিডিজের ওপাশ থেকে একজন মানুষ হাত তুলে আমাদের লক্ষ্য করে হাত নাড়তে লাগল। তার মাথায় সাদা চুল, আর তার সঙ্গে সাদা দাড়ি।

রীতেশ বসাক।

মায়ের মুখ থেকে পলকে রক্ত সরে গেল।

আমি মা-কে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম ভেতরে—ডাইনিং স্পেসে।

মগজেন্দ্র আমাদের অবস্থা দেখে বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, 'বাবু, কী হয়েছে? কী ব্যাপার? মা, কী হয়েছে?'

আমরা তখন ওর কথার জবাব দেব কী, ভয়ে মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজই বেরোচ্ছে না।

আমি আর মা দিশেহারার মতো এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগলাম। কী করব এখন?

মা আমার হাত চেপে ধরল, ভয় পাওয়া ফিসফিসে গলায় বলল, 'শিগগির পুলিশে ফোন কর! পুলিশে ফোন কর!'

'পুলিশে ফোন করে কোনও লাভ নেই, মা। হয়তো পুলিশই লোকটাকে এ-বাড়ির খোঁজ দিয়েছে—।'

ভাবছিলাম, আমার দু-চারজন বন্ধুকে ফোন করে দেখি। কিন্তু ঠিক তখনই নীচের দরজায় কেউ ধাক্কা দিতে শুরু করল।

ধাক্কাটা এমন জোরে পড়ছিল যে, মনে হচ্ছিল, দরজাটা এখুনি ভেঙে পড়বে।

মগজেন্দ্র দরজা খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে আর যেতে হল না। কারণ, দরজাটা সত্যি-সত্যিই ভেঙে পড়ল। দোতলা থেকেই আমরা তার মড়মড় শব্দ শুনতে পেলাম।

ছুটোছুটি করে আর লাভ নেই। আমি আর মা ড্রইং-ডাইনিং-এ চলে গেলাম। ঘরটাকে চটপট গুছিয়ে ফেললাম, কারণ অতিথি আসছে।

সিঁড়িতে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ওরা উঠে আসছে ওপরে।

চুপিসাড়ে চুরি করতে গিয়ে হঠাৎ লোকজনের কাছে ধরা পড়ে গেলে চোরের যেমন হতভম্ব দশা হয়, আমার আর মায়ের ঠিক তাই হল। ফ্যালফেলে মুখে চোখ বড়-বড় করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের পাশে প্রায় একইরকম এক্সপ্রেশান নিয়ে দাঁড়িয়ে সেকেলে মরচে ধরা রোবট মগজেন্দ্র।

ওরা তিনজন দরজা দিয়ে এসে ঢুকল।

রীতেশ বসাক, উমেশ সকসেনা, আর জনার্দন সাহা।

রীতেশ বসাক ছাই রঙের ঢোলা প্যান্ট পরেছেন, তার সঙ্গে কালো ফুলহাতা শার্ট আর ধবধবে সাদা টাই। কোমরে বাদামি রঙের বেল্ট। তার সঙ্গে সাদা চুল, সাদা দাড়ি-গোঁফ এমন সুন্দর মানিয়েছে যে, ওঁকে ফিল্মের অভিনেতা বলে মনে হচ্ছিল। আর ওঁর দুপাশে বাকি দুজনকে খুব মামুলি দেখাচ্ছিল।

উমেশ সকসেনা যথাসম্ভব ফিটফাট হয়ে এসেছে। গায়ে সবুজ-সাদা স্ট্রাইপ্‌ড শার্ট আর কালো প্যান্ট।

কিন্তু পোশাকআশাক ঠিকঠাক হলেও ওকে ততটা সম্ভ্রান্ত লাগছিল না।

জনার্দন সাহার একটা হাত পকেটে ঢোকানো। গায়ে পোলো নেক বেগুনি টি-শার্ট। পায়ে ব্লু জিন্‌স। আর পকেটে রিভলভার থাকলেও থাকতে পারে।

রীতেশ জেঠু মায়ের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। তার সঙ্গে ছোট্ট করে হাসলেন ঃ 'বোনটি আমার, সব কুশল-

মঙ্গল তো? দ্যাখো, কেমন নেমন্তন্ন ছাড়াই চলে এলাম...।'

লোকটাকে দেখে আমার গা জ্বালা করছিল। সম্ভবত মায়েরও। আর মগজেন্দ্র তো এসব অনুভূতির ঊর্ধ্বে!

দুটো লম্বা সোফায় ওরা তিনজন নির্লজ্জের মতো বসে পড়ল।

রীতেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? বোসো, বোসো—।'

তারপর পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করলেন। সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'তোমাদের এ-বাড়িটা মন্দ নয়। বেশ একটা অ্যান্টিক-অ্যান্টিক ভাব আছে...।'

আমি আর মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে অসভ্য লোকটার কথা শুনতে লাগলাম।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। মগজেন্দ্রর দিকে সিগারেট ধরা আঙুল উঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওই লোহার মালটা কী? ওটা নড়েচড়ে?'

'ও মগজেন্দ্র—' আমি বললাম, 'আমাদের ডোমেস্টিক রোবট। বাবার হাতে তৈরি...।'

আমার কথা শুনে রীতেশ জোরে হেসে উঠলেন। ওর চামচা দুজনও তাল মিলিয়ে হেসে উঠল।

হাসি থামলে রীতেশ মগজেন্দ্রকে হুকুম করলেন, 'মগজেন্দ্র, আমাদের জন্যে তিন গ্লাস জল নিয়ে এসো তো—।'

সঙ্গে-সঙ্গে মগজেন্দ্র রান্নাঘরের দিকে রওনা হল।

সেটা লক্ষ করে রীতেশ বললেন, 'এই মালটায় দেখছি ভয়েস রিকগনিশান বেস্‌ড অ্যাক্টিভেশান লাগানো নেই! গুড—ভেরি গুড!' তারপর হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন মা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই স্নেহমাখানো অনুরোধের গলায় বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোনটি আমার? বোসো, বোসো—।'

রীতেশ দেখলেন, আর কোনও সোফা খালি নেই। তখন জনার্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জনি, ওই টুলটা নিয়ে এসো। আমার বোনটিকে বসতে দাও...।'

জনার্দন—অথবা, জনি—আধুনিক ডোমেস্টিক রোবটের পাঁচগুণ গতিতে, প্রায় ছুটে গিয়ে, ঘরের এককোণে রাখা একটা টুল নিয়ে এসে মায়ের কাছে রাখল, বলল, 'বসুন, ম্যাডাম।'

মা তখনও বসছে না দেখে আমি প্রায় ফিসফিস করে মা-কে বললাম, 'বোসো, মা। প্লিজ—।'

মা এবার টুলে বসল। গায়ে জড়ানো শাড়ির আঁচলটা ঠিকঠাক করে নিল। দেওয়ালে টাঙানো বাবার ফটোর দিকে একপলক তাকাল।

মগজেন্দ্র তিনটে কাচের গ্লাস আর একজগ জল নিয়ে ফিরে এল। ও যেভাবে হ্যাঁচকা মেরে হাঁটছিল তাতে পুরোনো আমলের ফিল্মের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

রীতেশদের সামনের টেবিলে গ্লাস আর জগ নামিয়ে রাখল ও।

'বাঃ, ছোট কাজ-টাজ পারে দেখছি!' মগজেন্দ্রকে প্রশংসা করে বলল উমেশ সকসেনা, 'আমি তো ভাবছিলাম এটার সি. পি. ইউ.-টাই বিগড়ে গেছে। এনিওয়ে, থ্যাংক্‌স, মগজেন্দ্র—।'

জনার্দন জগটা তুলে নিয়ে তিনটে গ্লাসে জল ঢালল। তারপর ওরা তিনজনেই জল খেল।

জলের গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রেখে রীতেশ ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মা-কে বললেন, 'বোনটি আমার, লেট আস কাম টু বিজনেস। প্রথম কথা, তোমাদের এই বাড়িটা খুঁজে পেতে আমাকে কোনও কষ্ট করতে হয়নি। কিরণ আমাকে বহু আগেই এই বাড়িটার কথা বলেছিল। তোমাদের কলকাতার বাড়িতেও চায়ের আসরে এই বাড়িটার কথা অনেকবার শুনেছি। আর এই—' মগজেন্দ্রর দিকে আঙুল দেখিয়ে : 'লোহার মালটার কথাও শুনেছি। হেঁটে-চলে বেড়ানো লোহার জঞ্জাল।'

মা বলল, 'কাজের কথায় আসুন। কে কী টাইপের জঞ্জাল সে আমি ভালো করেই জানি। মাংস আর হাড়গোড়ের জ্যান্ত জঞ্জালকে কখনও হেঁটে-চলে বেড়াতে দেখেছেন?'

মায়ের প্রতিক্রিয়ায় হো-হো করে হেসে উঠলেন রীতেশ। সিগারেট মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জোরে হাততালি দিয়ে উঠলেন : 'এনকোর! এনকোর! বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে বিধবাদের এরকম তেজি ডায়ালগ শুনে দারুণ খুশি হতেন।'

জনার্দনকে ইশারা করলেন রীতেশ।

জনার্দন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ডানহাতটা পকেটে ঢোকানো।

রীতেশ বললেন, 'শোনো বোনটি আমার এবং ভাগ্নে আমার। জনির পকেটে যা আছে সেটা আমার পকেটেও আছে। আর পুলিশে ফোন-টোন করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। ওসব চ্যাপ্টার আমি ক্লোজ করে এসেছি। তোমাদের নামে আমি তিনটে ক্রিমিনাল সুট ফাইল করেছি। তার মধ্যে কোম্পানির প্রপার্টি চুরি করার কেসটাও আছে। সুতরাং এখন শুধু বলো, ওগুলো দেবে কি দেবে না।'

আমি বললাম, 'না, দেব না!'

রীতেশ মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করেছিলেন। ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখের বিরক্ত রাগ-রাগ ভঙ্গিটা চট করে পালটে হেসে ফেললেন : 'না, তোমাকে দিতে হবে না, ভাগ্নে—আমি নিয়ে নেব।' উমেশ সকসেনার দিকে ফিরলেন : 'উমেশ, গেট ইট। র‍্যানস্যাক দ্য ব্লাডি হাউস—।'

উমেশ আর জনি সঙ্গে-সঙ্গে দম দেওয়া পুতুলের মতো সুপার-অ্যাক্টিভ হয়ে গেল।

ঘর সার্চ করতে শুরু করল ওরা। আর সার্চ করার নামে সমস্ত জিনিসপত্র টান মেরে-মেরে ফেলতে লাগল।

ডাইনিং টেবিল উলটে দিল। চেয়ারগুলো ছুড়ে ফেলে দিল। ফ্রিজ খুলে সমস্ত খাবারদাবার অবহেলায় ছড়িয়ে দিল চারদিকে। তারপর ফ্রিজটাকে দড়াম করে উলটে দিল মেঝেতে।

দেওয়ালে টাঙানো বাবার ফটোটা টান মেরে খুলে নিল জনার্দন। খ্যাক করে একদলা থুতু ছেটাল ওটার ওপরে। তারপর ফটোটা ছুড়ে দিল মেঝেতে।

কাচ ভাঙার শব্দ নয়, আমার আর মায়ের বুক ভাঙার শব্দ হল।

মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে জনি পকেট থেকে পিস্তল বের করে মায়ের নাকের ওপর প্রায় ঠেকিয়ে ধরল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'শব্দ কোরো না। করলে পারমানেন্টলি চুপ করিয়ে দেব।'

মা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

তাই দেখে আমি 'মা—' বলে ডেকে উঠলাম।

মগজেন্দ্র 'কী হচ্ছে? কী হচ্ছে?' বলে ওর ধাতব গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

জনার্দন আমার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'চোপ!'

তারপর ও আর উমেশ একটা বেডরুমের দিকে রওনা দিল। আর তখনই মগজেন্দ্র আমাকে বলল, 'বাবু, এখনই সব জ্বালিয়ে দাও।'

রীতেশ বসাক উঠে দাঁড়ালেন। মগজেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী জ্বালিয়ে দিবি রে?'

মগজেন্দ্র ওকে ভেংচে বলে উঠল, 'তোকে বলব কেন রে?'

'ভারি অসভ্য রোবট তো!' মন্তব্যটা করেই রীতেশ আমার দিকে মনোযোগ দিলেন।

আমি তখন ভাঁড়ার ঘর লক্ষ্য করে দৌড়চ্ছি। ওখানে একটা পুরোনো চটের থলের ভেতরে মাইক্রোসিডি আর বাঁধানো খাতাগুলো কাল রাতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর তার পাশেই রেখেছি পেট্রলের জেরিক্যান।

ছুটে গিয়ে চটের থলেটা একহাতে নিলাম, আর অন্য হাতে পলিথিনের ক্যান তুলে নিলাম। তারপর হতভম্ব রীতেশ বসাকের পাশ দিয়ে ছুটে সোজা ঝুলবারান্দায়। থলেটা মেঝেতে রেখে তার ওপরে পেট্রলের ক্যান উপুড় করে দিলাম।

রীতেশ বসাক বোধহয় কিছু আঁচ করতে পারলেন। তিনি 'সুকি, কী করছিস? আরে কী করছিস?' বলে চেঁচাতে লাগলেন।

আমার তখন কোনওদিকে মন নেই। আমার সামনে এখন একটাই কাজ।

পকেটে দেশলাই আগে থেকেই রেখে দিয়েছিলাম। সেটা পকেট থেকে বেরোল। তা থেকে কাঠি বেরোল। ঘষা খেল দেশলাইয়ের বাক্সে। জ্বলে উঠল। পড়ল পেট্রল-ভেজা থলের ওপরে।

দপ করে লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখা। দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল।

ততক্ষণে রীতেশের চিৎকারে জনি আর উমেশ দৌড়ে ফিরে এসেছে ড্রইংরুমে।

রীতেশ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই বাচ্চা জানোয়ারটা কীসব পুড়িয়ে দিল! দ্যাখো শিগগির।'

আমি ছুটে বারান্দা থেকে ড্রইংরুমে চলে এসেছি। মা তখন দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'পুড়িয়ে দিলি? জ্বালিয়ে দিলি?'

আমি মা-কে জড়িয়ে ধরলাম। মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'সব আছে, মা, সব আছে। বাবার জিনিস কিছুই নষ্ট হয়নি...।'

জনি আর উমেশ ওদের গায়ের জামা খুলে ঝাপটা মেরে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আগুনকে কিছুতেই হারাতে পারছিল না।

রীতেশ একটা হিংস্র গর্জন করে উঠলেন। পাগলের মতো ছুটে এলেন আমার কাছে। আমার গালে সপাটে এক থাপ্পড় মারলেন।

আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। গালটা অসহ্যরকম জ্বালা করতে লাগল।

মগজেন্দ্র 'বাবু!' বলে ডেকে উঠল। তারপর আমার কাছে আসার জন্যে হাঁটা দিয়েছে।

মা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল ঃ 'আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন! সুকিকে ছেড়ে দিন!'

আমি মায়ের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালাম। এবং সামাজিক ব্যাকরণ ভুলে রীতেশ বসাকের গালে থাপ্পড়টা দুই দিয়ে গুণ করে ফিরিয়ে দিলাম।

বাজি ফাটার শব্দ হল। রীতেশ ছিটকে পড়লেন মেঝেতে। আমার হাত ঝনঝন করে উঠল, ব্যথা করতে লাগল।

সেই অবস্থাতেই রীতেশ নোংরা গালাগাল দিয়ে বলে উঠলেন, 'শালা বিধবার বাচ্চা! তোকে দেখাচ্ছি মজা। আমার গায়ে হাত তোলা!'

উঠে দাঁড়ালেন রীতেশ। একইসঙ্গে পকেট থেকে একটা চকচকে অটোমেটিক মেশিন পিস্তল বের করে আমার কপালে তাক করলেন ঃ 'শোন্, আমি এত বোকা নই। তোর বাবার সম্পত্তি মোটেই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়নি। বল্, ওগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস!'

মগজেন্দ্র আমার কাছে চলে এসেছিল। ধাতব গলায় বলল, 'বাবুকে ভয় দেখিয়ো না। পিস্তল সরিয়ে নাও—।'

'ফোট সালা রোবটের বাচ্চা!' মুখ খিঁচিয়ে বললেন রীতেশ। পিস্তলের সেফটি ক্যাচ 'ক্লিক' শব্দে অন করলেন।

মগজেন্দ্র আচমকা হাত বাড়িয়ে রীতেশের পিস্তল ধরা হাত চেপে ধরল। ওঁর কবজিটা মোচড় দিয়ে পিস্তলের নল ঘুরিয়ে ধরল ওঁরই দিকে।

রীতেশ যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগলেন।

'ছাড়! ছাড় বলছি! উঃ, মরে গেলাম! মরে গেলাম!'

আগুনের সঙ্গে লড়াই থামিয়ে জনি আর উমেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। বসের দুর্দশা দেখে ওরা ছুটে এল ঘরের ভেতরে। আর ছুটে আসতে-আসতেই জনি রিভলভার বের করে গুলি চালাল।

গুলির শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে আমি আর মা ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আর ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের 'ঠং' শব্দটাও শুনতে পেলাম।

জনির গুলিটা লেগেছে মগজেন্দ্রর লোহার বডিতে—লেগে ছিটকে গেছে।

জনি আর উমেশ বসকে বাঁচানোর জন্যে মগজেন্দ্রর হাত ধরে টানাটানি করছিল। আর রীতেশ 'থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স। থ্রি ল'জ!' বলে চেঁচাচ্ছিলেন।

ল'-তে কোনও কাজ হচ্ছে না দেখে তিনি জনিকে বললেন, 'শিগগির বিধবাটাকে নয় ছোঁড়াটাকে গুলি কর! শিগগির!'

জনি সে-কথা শুনে কিছু একটা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মগজেন্দ্র একটা পা তুলে জনির পেটে এক প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিল।

সংঘর্ষের শব্দের মধ্যে হাড়গোড় ভাঙার শব্দ মিশে ছিল কি না বুঝতে পারলাম না। তবে জনির বডিটা সোজা উড়ে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। হাতের রিভলভারটা কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। ওর বডিটা ডেডবডি হয়ে গেল কি না কে জানে!

এক হাতে রীতেশকে ধরে ছিল মগজেন্দ্র। অন্য হাতটা বাড়িয়ে ও উমেশের কলার চেপে ধরল। এক ঝটকায় ওকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ওর বুকের ওপরে একটা লোহার পা তুলে দিল।

উমেশ সকসেনা তখন ওর বসের মতো 'থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স! এই রোবটটা সেগুলো ফলো করছে না, স্যার—' বলে চি-চি করছে।

মগজেন্দ্র ধাতব গলায় বলল, 'বাবুর গায়ে হাত দেওয়া! মা-কে বিধবা-বিধবা বলে অপমান করা! বড়বাবুর ফটোতে থুতু দিয়ে ভেঙে ফেলা! বড়বাবু মরে গেছে বলে আমিও কি মরে গেছি?'

মগজেন্দ্র আমার আর মায়ের দিকে তাকাল ঃ 'পুলিশে খবর দাও, মা। তারপর দ্যাখো পুলিশ এসে এদের কী হাল করে! রিভলভার দিয়ে মা-কে আর বাবুকে মারতে যাওয়া!'

বাইরের বারান্দায় থলেটা তখন পুড়ে ছাই। পোড়া গন্ধে আমাদের ঘরগুলো ভরে গেছে। ধোঁয়ার খানিকটা উড়ে এসেছে ঘরের ভেতরে। পাখার হাওয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

রীতেশ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। বারবার 'ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।' বলছেন। আরও বলছেন, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আর কখনও আমি ওদের ডিসটার্ব করতে আসব না। প্রমিস করছি। প্লিজ, ছেড়ে দাও—।'

মগজেন্দ্র ওঁর পিস্তলটা একটানে কেড়ে নিল। হাতের প্রবল চাপে ওটার নলটা দুমড়ে দিল। তারপর ফেলে দিল মেঝেতে।

'ঠং' শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই রীতেশ মগজেন্দ্রকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি...তুমি আইজ্যাক অ্যাসিমভের থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স...মানো না?'

মগজেন্দ্র জবাব দিল, 'কে আইজ্যাক অ্যাসিমভ? গায়ে মাখে, না মাথায় দেয়? আমি শুধু একজন আইজ্যাককেই জানি—স্যার আইজ্যাক নিউটন। আর ওঁর থ্রি ল'জ অফ মোশান...।'

উমেশ সকসেনার বুকের ওপর থেকে পা সরিয়ে রীতেশ বসাকের কাছে গেল মগজেন্দ্র।

রীতেশ ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

মগজেন্দ্র বলল, 'স্যার আইজ্যাকের সূত্রের কোনও জবাব নেই। ওঁর থার্ড ল'-টা তোর মনে আছে?' রীতেশকে প্রশ্ন করল, 'মনে না থাকলে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান আর বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। বুঝলি?'

এই কথা বলে মগজেন্দ্র রীতেশের গালে একটা হালকা থাপ্পড় কষাল।

রীতেশ বসাক 'বাপরে' বলে পাঁচহাত দূরে ছিটকে পড়লেন। নির্ঘাত ওঁর চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে।

'এটা হল তোর ক্রিয়ার সমান আর বিপরীত প্রতিক্রিয়া।' মগজেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলল।

উমেশ সকসেনা তখন বুকে হেঁটে মগজেন্দ্রর কাছে পৌঁছে গেছে। আর ওর একটা পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে।

আমি আর মা বাবার নিজের হাতে তৈরি রোবটটার কাছে এগিয়ে গেলাম।

মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই আমার বড় ছেলে—।'

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ইস্পাতের গালে একটা চুমু খেলাম। বললাম, 'গজমেন্দ্র, আই লাভ য়ু—।' ✽✽✽